মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৫, সংখ্যা-০৩

এপ্রিল ২০১৬ ইং, রজব ১৪৩৭ হি., চৈত্র ১৪২২ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

رجب ١٤٣٧ھ ابريل ٢٠١٦م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.............................. ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৬..... ৪

দরসে ফিকহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৬........ ৮

মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১১

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

তাওবা-ইস্তেগফার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার উপায়....... ১২

“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :

বিভিন্ন গোমরাহ দল : উলামায়ে কেরামের করণীয় (শেষ কিস্তি)... ১৪

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস................................. ২১

মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৬....... ২৮

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-১.......................... ৩২

মাওলানা কাসেম শরীফ

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৬

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে

যুগের আবু হানীফা.................................... ৩৯

মুফতী শরীফুল আজম

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮

ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com

www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের বিয়োগ : আমাদের করণীয়

একের পর এক খবর আসছে বড় বড় উলামায়ে কেরাম ও মুরব্বিরা ইন্তেকাল করছেন। তাঁদের এই বিদায় দ্বীনি হালকার জন্য বড়ই পরিতাপের বিষয়। যেভাবে পদ খালি হচ্ছে, সেভাবে গড়ে ওঠার লক্ষণও ক্ষীণপ্রায়। তথাপি তাঁদের রেখে যাওয়া দ্বীনি আমানতগুলো আমাদেরই ধরে রাখতে হবে। তাঁদের মতো যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে আমাদেরই। অন্যথায় আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়ার কোনো পথ থাকবে না।

কয়েক মাস হলো উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) ইন্তেকাল করেছেন। এর কিছুদিনের মাথায় চলে গেলেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম (রহ.)। মাত্র কিছুদিন হলো আমরা আরো কয়েকজন বড় বড় আলেমকে হারালাম। জামিয়া ইসলামিয়া দারুল মাআরিফ চট্টগ্রামের শায়খুল হাদীস, প্রবীণ আলেমে দ্বীন হযরতুল আল্লাম মাওলানা ইহসান সাহেব গত ২০/০৩/২০১৬ ইং তারিখ রাত ৩টায় ইন্তেকাল করেছেন। একই তারিখ প্রায় শত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন এ দেশের সবচেয়ে প্রবীণ আলেম বরমাউত্তর মাদরাসা রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রামের সদরে মুহতামিম মাওলানা নূরুল হক সাহেব (রহ.)। খবরে প্রকাশ গত ১১ মার্চ ২০১৬ ইং তারিখে জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরের মুহতামিম প্রবীণ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ কাসেমী আশরাফী (রহ.) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি জামিয়া আশরাফিয়ার প্রায় ৫৫ বছর সফল মুহতামিম ছিলেন। তিনি ছিলেন জামিয়া আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত থানভী (রহ.)-এর প্রখ্যাত খলীফা হযরত মাওলানা মুফতী হাসান আমরিতসরী (রহ.)-এর সুযোগ্য সন্তান। এরই মধ্যে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নামকরা আরো বহু উলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন। তাঁদের ইন্তেকালে আমাদের এবং পুরো জাতির যে ক্ষতি হয়েছে, তা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূরণ করে দেন।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইল্ম বের করে ছিনিয়ে নেবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইল্ম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোনো আলেম বাকি থাকবে না তখন লোকেরা জাহেলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফাতওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে। (বুখারী, হা. ১০০)

এসব প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁরা শুধু ইলমের কারণেই জাতির রাহবার আলেম ছিলেন না। বরং তাঁরা কোরআন-সুন্নাহে বর্ণিত আলেমের নমুনা মতেই গড়ে উঠেছিলেন। সুতরাং তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে হলে আমাদেরকেও সেরূপ যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহ তা'আলাকে তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই ভয় করেন। (সূরা ফাতির ২৮)

وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم

উলামারা হলেন নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ দীনার আর দিরহামের ওয়ারিস বানান না বরং তাঁরা উত্তরসূরি বানান ইলমের। (আবু দাউদ, হা. ৩৬৪১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا

যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় এরূপ ইলম যে শিক্ষা করবে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ লাভের আশায় তাহলে সে (জান্নাতে যাওয়া দূরের কথা) জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (আবু দাউদ, হা. ৩৬৬৪)

আকাবির ও আসলাফগণ কোরআন-হাদীসে বর্ণিত নমুনার আলেম বানানোর জন্যই মূলত কওমী মাদরাসার ধারাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আমানত হিসেবে রেখে গেছেন। সুতরাং আমাদের মাঝেও সেরূপ আলেম হওয়ারই সংকল্প ও চেষ্টা থাকতে হবে।

আমরা সব সময় লক্ষ করতাম হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) মাদরাসাগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করতেন। অনেক সময় যৎসামান্য বিষয়েও এমন কড়াকড়ি করতেন, যা আমাদেরও বুঝে আসত না। পরে বিভিন্ন বাস্তবতার আলোকে তাঁর হিকমত আমরা বুঝতে সক্ষম হতাম।

হযরতের সব সময় চিন্তা ছিল, আলেম তৈরির এই কাঠামোতে যারা অনুগমন করছে তার মূল স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে তারা গড়ে উঠছে কি না? এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের আভাস পেলেই তিনি কড়াকড়ি আরম্ভ করতেন। কোনো ব্যতিক্রম হলে তিনি ভাবতেন হয়তো কাঠামোর সমস্যা, না হয় উৎপাদনের সমস্যা। কাঠামোগত কোনো ব্যতিক্রম না আসার জন্য তিনি সব সময় কওমী মাদরাসার নিসাব ও আদর্শ বিষয়ে আপসহীন অটল অবিচল থাকতেন। উৎপাদনে কোনো প্রকার সমস্যা না হওয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের তারবিয়্যাতের প্রতি বেশি বেশি জোর দিতেন।

পক্ষান্তরে কওমী মাদরাসার এই ছাঁচে সৃষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মডেল হলো হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.), হযরত মাদানী (রহ.), হযরত থানভী (রহ.), হযরত কাশ্মীরি (রহ.), হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন (রহ.), হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.), হযরত মুফতী আযীযুল হক (রহ.), হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)সহ হাজারো বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন।

সুতরাং আমরা যদি পূর্বসূরিদের এই আমানত রক্ষায় যোগ্য হতে চাই তবে তাঁদের নমুনা ও ছাঁচেই তৈরি হতে হবে আমাদেরকে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৫/০৩/২০১৬ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই কেবল ভয় করে। (সূরা ফাতির ২৮)

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে كذلك শব্দের পর বিরতি রয়েছে, যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে كذلك শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ ফলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে। (রূহুল মাআনী)

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে–

انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب

এতে নবী করীম (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য انما يخشى الله আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। انما শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, انما শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে, তেমনি কারো বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয়, তার মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকা জরুরি হয় না। (বাহরে মুহীত আবু হাইয়ান।)

আয়াতে علماء বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না। যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারেফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতে তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম, যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بكثرة الخشية

অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইলম নয় বরং সে জ্ঞানই ইলম, যা আল্লাহর ভয়সমৃদ্ধ। (শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী])

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়াতে ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়। (ইবনে কাসীর)

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) বলেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, সে আলেম নয়। (মাযহারী)

হযরত রবী ইবনে আনাস (রা.) বলেন–

من لم يخش فليس بعالم

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলেম নয়।

মুজাহিদ বলেন, انما العالم من خشى الله

অর্থাৎ কেবল সেই আলেম, যে আল্লাহকে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলেম কে? তিনি বললেন, اتقاهم لربه অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুর্তাযা (রা.) ফকীহ ও আলেমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন–

ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم فى معاصى الله تعالى ولم يومنهم من عذاب الله تعالى ولم يدع القرآن رغبة عنه الى غيره ـــ

অর্থাৎ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গোনাহ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহর আযাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং কোরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি উৎসাহী করে না।

আল্লাহর ভয় নেই এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায়– উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা ওপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবী জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয় কোনো সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের ওপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিবিধান পালন করে। আবার কখনো এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্য জরুরি। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম-জরুরি নয়। (তাফসীরে বয়ানুল কোরআন, তাফসীরে মাআরিকুল কোরআন)

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৬

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং-৩৫ :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا السَّهْمِيُّ، ثنا فَائِدَ أَبُو الْوَرْقَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " :مَنْ قَالَ إِحْدَى عَشَرَةَ مَرَّةً :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَىْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি ১১ বার এই দু'আ পড়বে তার জন্য ২০ লাখ নেকী লেখা হবে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৮৫ হা. ১৬৮২৭, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা. ২২৮১, মু'জামু ইবনে আসাকের হা. ১৫৬৪, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ হা. ৫২৮, ইবনে আসাকির হা. ১৫৬৪)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, ইসলাম গ্রহণ করলে কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এরপর পুনরায় হিসাব শুরু হয়। প্রতিটি নেকী দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত লেখা হয় এবং এটি হতেও বেশি আল্লাহ তা'আলা যে পরিমাণ ইচ্ছা করেন লেখা হয়। আর গোনাহ একটিই লেখা হয়। আর যদি আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন, তবে তা লেখা হয় না।

قَالَ مَالِكٌ :أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ :الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا "

(বুখারী হা. ৪১, নাসায়ী হা. ৪৯৯৮)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ.

অন্য এক হাদীসে আছে, বান্দা যখন নেককাজের ইচ্ছা করে তখন শুধু ইচ্ছার কারণে একটি নেকী লেখা হয়। পরে যখন আমল করে তখন ১০ নেকী হতে সাত শত পর্যন্ত যেই পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, লেখা হয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ :قَالَ :إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

(বুখারী শরীফ ৭/৩৪০ হা. ৬৪৯১, মুসলিম শরীফ ১/১১৮ হা. ১৩১, মুসনাদে আহমদ ১/৩৬১ হা. ৩৪০১, শু'আবুর ঈমান)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, আমল ছয় প্রকার এবং মানুষ চার প্রকার। দুটি আমল হলো ওয়াজিবকারী, দুটি সমান সমান, একটি দশ গুণ, আরেকটি সাত শত গুণ। (যে দুটি আমল ওয়াজিবকারী এর একটি হলো) (১) যে ব্যক্তি শিরক হতে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (২) যে ব্যক্তি শিরক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৩) আর যে আমল সমান সমান তা হলো অন্তরে নেককাজের দৃঢ় ইচ্ছা আছে (কিন্তু আমল করার সুযোগ হয়নি)। (৪) আর আমল করলে দশ গুণ সাওয়াব হবে। (৫) আর আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ ইত্যাদিতে) খরচ করা সাত শত গুণ সাওয়াব রাখে। (৬) আর যদি গোনাহ করে তবে একটির বদলা একটিই হবে। আর চার প্রকার মানুষ হলো : কিছু লোক এমন আছে, যাদের জন্য দুনিয়াতে আরাম আখেরাতে কষ্ট, কিছু লোক এমন আছে, যাদের ওপর দুনিয়াতে কষ্ট আখেরাতে আরাম। কিছু লোক এমন আছে যে, যাদের ওপর উভয় স্থানে কষ্ট (দুনিয়াতে অভাব-অনটন, আখেরাতে আযাব)। কিছু লোক এমন আছে যে, তাদের ওপর উভয় জাহানে আরাম।

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :الْأَعْمَالُ سِتَّةٌ، وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ، فَمُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْحَسَنَةُ بِسَبْعِ مِائَةٍ، فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ :مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ :فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّى يُشْعِرَهَا قَلْبَهُ، وَيَعْلَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ، وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ، مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(মুসনাদে আহমদ ৪/৩৪৫ হা. ১৯০৩৫, আল মু'জামুল কাবীর ৪/২০৬ হা. ৪১৫৩, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৪/৪৫ হা. ৬১৭১, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৮৭ হা. ২৪৪২, শু'আবুল ঈমান ৪/৩২ হা. ৪২৬৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

ঘ.

অন্য হাদীসে আছে, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে শুনেছি, কোনো কোনো নেকীর সাওয়াব ২০ লক্ষ পর্যন্ত মিলে থাকে।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ :أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ :إِنَّ الْحَسَنَةَ تُضَاعَفُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ .قَالَ :وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ :كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ :إِنَّ اللَّهَ لَيُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ

(মুসনাদে আহমদ ২/২৯৬ হা. ৭৯৪৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৩/৩৫০ হা. ৩৫৪৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-৩৬ :

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ -الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি অজু করে এবং উত্তম রূপে করে (অর্থাৎ অজুর সুন্নাত ও আদবসমূহ আদায় করে অজু করে) অতঃপর এই দু'আ পড়ে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।

(মুসলিম শরীফ ১/২০৯ হা. ২৩৪, আবু দাউদ শরীফ ১/১১৮ হা. ১৬৯, তিরমিযী শরীফ ১/৭৭ হা. ৫৫, ইবনে মাজাহ শরীফ ১/২৭৩ হা. ৪৭০, সুনানে দারেমী ১/১৯৩ হা. ৭১৭, নাসাঈ ১/৯৩ হা. ১৪৮)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে সে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করেনি এবং অন্যায়ভাবে কাউকেও হত্যা করেনি, সে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

إِلَّا اللهُ، وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَآخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا سُئِلَ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ "

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে প্রথমে তাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শেখাও। আর যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর 'তালিকীন' করো। যে ব্যক্তির প্রথম কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে এবং শেষ কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে যদি সে হাজার বছরও জীবিত থাকে (ইনশাআল্লাহ) তাকে কোনো গোনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ২/৩৯৭ হা. ৮৬৪৯)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

এই হাদীসের শাওয়াহেদ হিসেবে যেসব হাদীস পেশ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১.

وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ :حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

তোমরা মৃত্যুশয্যায় শায়িতকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তালকীন করো।

(মুসনাদে আহমদ ৩/৩ হা. ১০৯৯৩, সহীহে মুসলিম ২/৬৩১ হা. ৯১৬, সুনানে আবু দাউদ ৩/৪৮৭ হা. ৩১১৭, সহীহে ইবনে হিব্বান ৭/২৭১ হা. ৩০৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

২.

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ -يَعْنِي :عَبْدَ الْكَرِيمِ -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي الَّذِي حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا أَفْصَحَ أَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ لَا تُبَالُوا مَتَى مَاتُوا، وَإِذَا أَثْغَرُوا فَمُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ

(জামেউস সগীর ২/৩৪৪ হা. ৮৯৬৫, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ [ইবনুস সুন্নী] ১/৩৭৩ হা. ৪২৩)

হাদীসটির মান : হাসান

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ أُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ

(আল মু'জামুল কাবীর ২/৩০৯ হা. ২২৮৫, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৩৫২ হা. ৮০৩৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৯ হা. ২৭, জামিউস মাসানীদ ৩/৫১ হা. ১৫৬১)

হাদীসটির মান : হাসান

হাদীস নং-৩৭ :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ,مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ,وَلَمْ يُرْفَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি একশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট করে উঠাবেন। আর যেদিন এই তসবীহ পড়বে সেদিন তার চেয়ে উত্তম আমলওয়ালা কেবল ঐ ব্যক্তিই হতে পারবে, যে তার চেয়ে বেশি পড়বে।

(জামেউল মাসানীদ [ইবনে কাসীর] ১৩/৬৮৭ হা. ১১২৭৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৬, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৫১ হা. ১৩৮৪, মুসনাদে আহমদ ১/১৬১ হা. ১৩৮৪, মুসনাদে আবী এয়ালা ১/৩১৬ হা. ৬৫১, জামেউস সাগীর, মুসনাদুশ শামিয়ীন লিততাবরানী ২/১০৩ হা. ৯৯৪)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-৩৮ :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَا :أنا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا أَبِي، نا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْسَكِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " :افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَا إِلَهَ

ক.

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে এই পর্যন্ত লালন-পালন করে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে শুরু করে তার হিসাব মাফ হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ ,حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ رَبَّى صَغِيرًا حَتَّى يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ,لَمْ يُحَاسِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(আল মুজামুল কাবীর ৫/২৩৪ হা. ৪৮৬৫, আল মুজামুস সগীর ১/২৫২ হা. ৬৭৩, আল কামেল [ইবনে আদী] ৩/৩৭৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ.

কোনো হাদীসে এও এসেছে, মৃত্যুর সময় যার এই মোবারক কালেমা নসীব হয়, তার পেছনের গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/৩৮৭ হা. ৬০৪৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

গ.

এক হাদীসে আছে, মোনাফেকদের এই কালেমা পড়ার সৌভাগ্য হয় না।

وَأخرج أَبُو الْقَاسِم الْقشيرِي فِي أَمَالِيهِ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا إِذا ثقلت مرضاكم فَلَا تملوهم قَول لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَكِن لقنوهم فَإِنَّهُ لم يختم بِهِ لمنافق قطّ

(তালখীসুল হাবীর ৪/১০২, জমউল জাওয়ামে ১১১৪)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-৩৯ :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِءٍ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا (وفى المستدرك وَلَا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হতে না কোনো আমল আগে বাড়তে পারে আর না এই কালেমা কোনো গোনাহকে না মুছে ছাড়তে পারে।

(ইবনে মাজাহ শরীফ ৪/২৪৬, হা. ৩৭৯৭, মুসনাদে আহমদ ৬/৪২৫ হা. ২৭৩৮৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫১৩ হা. ১৮৯৩, আল মুজামুল কাবীর ২৪/৪২৪ হা. ১০৬১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১১/৩৯৫ হা. ২০৫৮০)

হাদীসটির মান : সহীহ (হাকেম)

হাদীস নং-৪০ :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ -شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা রয়েছে। (কোনো বর্ণনা মতে ৭৭টি) এগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া, আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা, ইট, লাকড়ি ইত্যাদি) হটিয়ে দেওয়া। আর লজ্জাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(বুখারী ১/১০ হা. ৭, মুসলিম ১/৬৩ হা. ৩৫, নাসাঈ ৮/১১০ হা. ৫০৫, ইবনে মাজাহ ১/৪৩ হা. ৫৭, তিরমিযী ৫/১২ হা. ২৬১৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

সহীহ হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে : 'তুমি যখন লজ্জাশীল হবে না, তখন যা ইচ্ছা তা-ই করো।'

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ :سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

(বুখারী শরীফ ৪/৫০৮, হা. ৩৪৮৪, মুসনাদে আহমদ ৪/১২১, হা. ১৭০৯০, আল মুজামুল কাবীর ১৭/২৩৫, হা. ৬৫৩, ইবনে মাজা শরীফ ৪/৪৬০, হা. ৪১৮২, মুসনাদে ত্বয়ালসী ৩/৩৪৪, হা. ৬৫৫)

হাদীসটির মান : সহীহ

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৬

মুফতী শাহেদ রহমানী

ছবিযুক্ত পোশাক পরিধানের বিধান :

সাহাবায়ে কেরাম, চার মাযহাবের ইমামগণ ও সব আলেমের ঐকমত্যে কোনো প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা হারাম। ভাস্কর্য, হস্তশিল্প, অঙ্কন, ক্যামেরা বা আধুনিক যেকোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে কারো ছবি বানানো হারাম। হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর বিধান অভিন্ন। (ইমদাদুল মুফতীয়ীন : ৮২৫-৮২৬)

আধুনিক যুগে কোনো কোনো দেশের কোনো কোনো আলেম মনে করেন, ছবি ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, মূর্তিপূজা ও ব্যক্তি পূজার পথ রুদ্ধ করা। তাই তাঁদের মতে, যেসব ছবি পূজা করা হয় না, অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা করা হয় না, সেগুলো বৈধ। এ ব্যাপারে রক্ষণশীল ও গ্রহণযোগ্য আলেমদের বক্তব্য ফুটে উঠেছে ইমাম নববীর লেখায়। তিনি লিখেছেন :

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَنُ أَوْ بِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ مَا كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَرِحَالِ الْإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ

অর্থ : ইমাম নববী (রহ.) বলেন, আমাদের শাফেয়ী মাযহাব ও অন্য মাযহাবের আলেমরা বলে থাকেন, কোনো প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটি কবিরা গোনাহ। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই ছবি দিয়ে কাউকে সম্মান করা হোক বা অপমান, উভয় অবস্থায় তা হারাম। কেননা এর ফলে আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন হয়ে যায়। কাপড়, বিছানা, মুদ্রা, বাসন-কোসন, দরজা বা অন্য যেকোনো কিছুতে ছবি আঁকা হারাম। প্রাণীর ছবি ছাড়া অন্যান্য ছবি হারাম নয়। যেমন–গাছপালা, উটের গদি (অশ্ব-জিন) ইত্যাদির ছবি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়। (শরহে নববী : ১৪/৮১)

ছবিযুক্ত পোশাকের বিধান :

ইসলামী শরীয়ত মতে, কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা হারাম। তবে প্রাণহীন বস্তু যেমন–বৃক্ষ, পাহাড়, ঝরনা ইত্যাদির ছবি বৈধ। (আল-বাহরুর রায়েক : ২/২৯, মেরকাতুল মাফাতিহ : ৪৪৮৯)

লক্ষণীয় যে অনেকে মনে করে, ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা কেবল নামাযের ক্ষেত্রে হারাম! ফলে তারা নামাযের সময় এ ব্যাপারে খেয়াল রাখলেও অন্য সময় উদাসীন থাকে। অথচ এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা। সর্বাবস্থায় ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা হারাম। তবে হ্যাঁ, নামাযে এমন পোশাক পরিধান করা গর্হিত অপরাধ।

و فى الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه او لم يصل (البحر الرائق ٢/٢٩)

'খোলাসা' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে : কোনো ছবিযুক্ত কাপড় দিয়ে নামায আদায় করা হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় তা মাকরূহে তাহরীমি বা হারাম। (আল-বাহরুর রায়েক : ২/২৯)

ক্রুশের ছবিযুক্ত পোশাক পরিধানের বিধান :

ক্রুশ হলো খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক। কোনো মুসলমানের জন্য ক্রুশের ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা হারাম। কেননা ক্রুশের ছবি যদিও কোনো প্রাণীর ছবি নয়, তবুও খ্রিস্টানদের সঙ্গে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে তা হারাম। প্রসিদ্ধ ফাতওয়ার কিতাব 'ফতওয়ায়ে শামী'তে এ বিষয়ে বলা হয়েছে :

والظاهر انه يلحق به الصليب وان لم يكن تمثال ذى روح لان فيه تشبها بالنصارى (شامية ١/٦٤٨)

অর্থ : এটি স্পষ্ট যে, ক্রুশের বিধান প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাকের মতো। উভয়টিই হারাম। ক্রুশ প্রাণহীন হলেও ক্রুশের ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করা হারাম খ্রিস্টানদের সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে। (ফতওয়ায়ে শামী : ১/৬৪৮)

এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে :

ان النبى ﷺ لم يكن يترك فى بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه (بخارى ٥٩٥٢)

অর্থ : নবী করীম (সা.) ঘরে প্রাণীর ছবি বা ক্রুশের নিশানা পেলে তা ভেঙে দিতেন। (বুখারী শরীফ, হা. ৫৯৫২)

ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি :

কোনো প্রাণীর ছবি তোলা, ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা বা দেয়ালে ফ্রেমবন্দি করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। ছবিতে ধারণকৃত প্রিয়জনের প্রিয় মুখের দিকে মানুষ ফিরে ফিরে তাকায়। পীর-ফকীর ও অতীব শ্রদ্ধাভাজন কারো ছবি আবেগপ্রবণ মানুষকে মস্তক অবনত করতে বাধ্য করে। কখনো এই ছবি শোকের স্মারক হয়ে ব্যক্তির জীবনকে দুঃখিত, ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতার সুযোগে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেলফি আসক্তি চোখে পড়ার মতো। সেলফি তোলা এখন চলতি ফ্যাশন, যেভাবে পছন্দের তারকাদের ছবিসম্বলিত গেঞ্জি-জার্সি গায়ে দেওয়া ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অধুনা সেলফি

ফ্যাশন রীতিমতো আতঙ্কের রূপ নিয়েছে। সাপের সঙ্গে সেলফি, অতঃপর সাপের কামড়ে মৃত্যু, বন্দুকের নলের সামনে সেলফি, অতঃপর বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গবেষকরা তরুণ প্রজন্মের এই সেলফি আসক্তিকে মানসিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানসিকতা বিকৃত হতে হতে এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, লাশ কিংবা লাশের পাশে একখানা সেলফি তোলা মানুষ 'পারিবারিক কর্তব্য' হিসেবে জ্ঞান করতে শুরু করেছে। উল্লিখিত দৃশ্যপট সামনে রাখলে ছবি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান উপলব্ধি করা সহজ হবে। আল্লাহর আইনের কার্যকারিতা চর্ম চোখে ধরা দেবে।

সমাজ উন্নয়ন ও সমাজের ক্ষয় রোধ করা ইসলামী বিধানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাই ইসলাম ধর্ম মতে, বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা, ছবি সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير (بخارى ٥٩٤٩)

অর্থ : (রহমতের) ফেরেশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর কিংবা কোনো (প্রাণীর) ছবি থাকে। (বুখারী শরীফ, হা. ৫৯৪৯)

অন্য হাদীসে এসেছে :

لا تدخل الملا ئكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب (ابوداود ٤١٥٢)

অর্থ : ওই ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কোনো ছবি, কুকুর বা এমন ব্যক্তি থাকে, যার ওপর গোসল করা ফরয। (আবু দাউদ, হা. ৪১৫২)

মহানবী (সা.) ছবির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি এর কঠোর বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) 'বাত্বহা' নামক স্থানে অবস্থান করে ওমর (রা.)-কে কা'বা শরীফের ভেতরের সব ছবি ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সব ছবি নিঃশেষ করার পর মহানবী (সা.) কা'বায় প্রবেশ করেন। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪১৫৬)

ছবি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি :

অবস্থাভেদে ভালো কাজের যেমন উঁচু-নিচু স্তর আছে, তেমনি মন্দ কাজেরও বিভিন্ন স্তর আছে। গোনাহ মানেই আল্লাহর সীমা অতিক্রম। আল্লাহর যেকোনো সীমারেখা অতিক্রম করা অপরাধ। তথাপি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করা মুফতীগণ গোনাহকে কবীরা ও সগীরা তথা ছোট-বড় দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কোনো গোনাহকে কবীরা তথা মহা অপরাধ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁরা এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, যেসব পাপের ফলে অতীতে দুনিয়ায় আযাব এসেছে অথবা ইহকাল বা পরকালে আযাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, সেসব গোনাহ গোনাহে কবীরা বা মহা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ মূলনীতি অনুসারে বলা যায়, বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা, ছবি সংরক্ষণ করা ও দেয়ালে ছবি টাঙানো কবীরা গোনাহ। কেননা ছবি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য হাদীসে আযাবের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এক হাদীসে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন :

اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (بخارى ٥٩٥٠)

অর্থাৎ : কেয়ামতের দিন ছবি নির্মাতারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। (বুখারী শরীফ, হা. ৫৯৫০)

তাদের অধিক শাস্তি দেওয়ার একটি কারণ হলো, তারা আল্লাহর সামনে সৃষ্টিকর্মের বাহাদুরি দেখায়! ছবি তুলে প্রকারান্তে তারা বোঝাতে চায়, আল্লাহ যেমন সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করছেন, অনুরূপ আমরা এগুলোর রূপ ও আকার তৈরি করতে সক্ষম! বিষয়টিকে হাদীস শরীফে এভাবে বলা হয়েছে :

اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله (بخارى ٥٩٥٤)

অর্থ : কেয়ামতের দিন সেসব লোককে সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে, যারা (ছবি বানিয়ে) সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আল্লাহর সাদৃশ্য অবলম্বন করে। (বুখারী শরীফ, হা. ৫৯৫৪) আশ্চর্য হলো, যতই বাহারি রং ব্যবহার করে ছবি নির্মাণ করা হোক না কেন, এ ছবিতে প্রাণসঞ্চার করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই কেয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের বলা হবে :

احيوا ما خلقتم (بخارى ٥٩٥١)

অর্থাৎ তোমরা যা 'সৃষ্টি' করেছ, তাতে প্রাণ দাও! (বুখারী শরীফ, হা. ৫৯৫১)

আজকাল ঘরে ঘরে ছবি টাঙানোর প্রথা শুরু হয়েছে। কী মুসলিম, কী অমুসলিম, কী ধনী, কী দরিদ্র সবার ঘরে ঘরে ছবি। পার্থক্য কেবল ফ্রেমে! কারোটা কাঠের বাঁধাই, কারোটা ফুল করা ফার্নিচারে কিংবা পাথরে মোড়ানো। অথচ আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। হাদীস শরীফে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ (بخارى ٥٩٥٥)

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) এক সফর থেকে ফিরে আসেন। (এসে তিনি দেখতে পান) আমি ছবিযুক্ত একটি (দেয়ালের) পর্দা টাঙিয়েছি। তিনি আমাকে তা সরিয়ে নিতে বলেন। অতঃপর আমি তা সরিয়ে ফেলি। (বুখারী শরীফ : হা. ৫৯৫৫)

যেসব ছবি অবৈধ :

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে ছবি সম্পর্কে যে কথাগুলো পাওয়া যায়, তার সারকথা হলো, ইসলামে কিছু ছবি বৈধ। কিছু ছবি অবৈধ। যেসব পদ্ধতিতে ছবি অবৈধ, তা কয়েক ধরনের। এক. ভাস্কর্য। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম। স্পষ্টভাবে হাদীস শরীফে এসেছে :

ان الملائكة لاتدخل بيتا فيه كلب، ولا صورة، ولا تماثيل ولا جنب

অর্থ : (রহমতের) ফেরেশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে কুকুর, ছবি, ভাস্কর্য ও এমন ব্যক্তি থাকে, যার ওপর

গোসল ফরয হয়েছে। (বুখারী)

দুই. আর্ট বা হাতে অংকিত কোনো প্রাণীর ছবিও সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। হাদীস শরীফে এসেছে :

من صور صورة امر ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ

অর্থ : যে ব্যক্তি (নিজ হাতে) ছবি নির্মাণ করে, কেয়ামতের দিন সে ছবিতে তাকে প্রাণসঞ্চার করতে বলা হবে। সে প্রাণ দান করতে পারবে না।

তিন. এমন সব ছবি ও মূর্তি হারাম, যেগুলোর পূর্ণ আকৃতিও অবয়ব গঠন করা হয়েছে, প্রাণ ছাড়া প্রাণীর সব কিছুই যার মধ্যে রয়েছে। চাই তা যেকোনো পদার্থ দিয়েই তৈরি হোক না কেন। হাদীস শরীফে এসেছে :

اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله (بخارى ٥٩٥٤)

অর্থ : কেয়ামতের দিন এমন লোকদের সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে সাদৃশ্য অবলম্বন করে। (বুখারী শরীফ, হা. ৫৯৫৪)

চার. কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যে ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়। আভিজাত্যের প্রতীক ভেবে যে প্রাণীর মূর্তি ও আকৃতি শোপিস হিসেবে সাজিয়ে রাখা হয় এগুলো হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি (দরজার) পর্দা ছিল। তাতে একটি পাখির ছায়াযুক্ত ছবি ছিল। কেউ এলে তা সামনে পড়ত। অতঃপর মহানবী (সা.) বললেন, আমার সামনে থেকে এটি সরিয়ে নাও। কেননা যখনই আমি এটা দেখি দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়। (মুসলিম শরীফ)

যেসব ছবি বৈধ :

স্মরণ রাখতে হবে, ইসলামে যেকোনো ছবি হারাম নয়। যেসব ছবি বৈধ, সেগুলো কয়েক প্রকার।

এক. প্রাণহীন যেকোনো বস্তুর ছবিযুক্ত ভাস্কর্য বৈধ। যেমন–পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নান্দনিক ছবি তোলা, সংরক্ষণ করা ও দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা বৈধ। শর্ত হলো, সেখানেও প্রাণীর ছবি থাকতে পারবে না। মহানবী (সা.) হযরত ইবনে আববাস (রা.)-কে বলেছেন :

ان كان لابد فاعلا فصور الشجر ومالا روح له (متفق عليه)

অর্থ : যদি তোমাকে ছবি তুলতেই হয়, তাহলে বৃক্ষ ও এমন বস্তুর ছবি তৈরি করো, যার মধ্যে প্রাণ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

দুই. যেসব ছবিতে কোনো প্রাণীর সব অঙ্গের মিলিত ও যৌথ রূপ প্রকাশিত হয় না, সেসব ছবি বৈধ। যেমন : বিচ্ছিন্নভাবে হাত, পা বা চোখের ছবি বৈধ। এর প্রমাণ হলো আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেছেন,

فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم يعب ﷺ على ذلك

অর্থ : দরজার পর্দায় লাগানো ছবিটি অতঃপর আমি টুকরো করে তা দিয়ে বালিশের কভার বানিয়েছি। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে আমার ওপর আপত্তি করেননি। (সিহাহ সিত্তাহ)

তিন. পাক-ভারত উপমহাদেশের সব আলেম ও আরব বিশ্বের রক্ষণশীল উলামায়ে কেরামের মতে, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তোলা সেলফি-ছবি নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত। তবে ধর্মীয় প্রয়োজনে যেমন হজে যাওয়ার জন্য বা জাগতিক অপরিহার্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন ডিজিটাল ছবি তোলার অনুমতি আছে। শরীয়তের ভাষায় এটাকে বলা হয় 'জরুরত'। এর মানে হলো, এই ছবি না হলে ব্যক্তির বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। যেমন রাষ্ট্রীয় পরিচয়পত্র, কর্মরত প্রতিষ্ঠানে চাকরি ইত্যাদির প্রয়োজনে ছবি তোলা বৈধ।

ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার তাত্ত্বিক কারণ :

যেসব হাদীসে ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ হলো, আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন। তবে এর বাইরেও ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার আরো কিছু হেকমত রয়েছে। এর প্রধান হেকমত হলো, শিরকের পথ রুদ্ধ করা, মূর্তি পূজা ও ব্যক্তি পূজা থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। কেননা একসময় পৃথিবীতে কোনো ধর্মীয় বিরোধ ছিল না। সব মানুষ শাশ্বত ইসলামে বিশ্বাসী ছিল। সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করত। পরে সবাই বিভক্ত হয়ে পড়ে। নতুন ধর্ম-দর্শন আবিষ্কার করে। এই সুযোগে মানুষের মধ্যে মূর্তি পূজা ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে এই ছবি ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে। যখন কোনো পুণ্যবান ও নেতৃস্থানীয় লোক মারা যেত, সাধারণ মানুষ ছবি ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে তার স্মৃতি ধারণ করে রাখত। অংকিত ছবি ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখত। এই ছবি দেখে কখনো তারা স্মৃতিকাতর হতো। কখনো সিজদাবনত হতো। এই কাজ আগের আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত লোকেরাও করত। সে সময় সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা ও আবেগের সব সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিল। ইসলামে ব্যক্তি পূজার স্থান নেই। মূর্তি পূজার স্থান নেই। প্রয়াত সম্মানিত ব্যক্তিরা অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র, তবে তাঁরা নমস্য নন। তাঁরা উপাস্য নন। আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য হতে পারে না। কোনো মানুষ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন। প্রতিটি মানুষের ক্ষয় আছে, লয় আছে, ক্ষুধা আছে, লুক্কায়িত বাসনা আছে। তাঁরা অশ্রদ্ধার পাত্র নন, তবে তাঁরা অতিমানবও নন। অতি আবেগপ্রবণতা মানুষের মন থেকে এসব সত্য মুছে দেয়। ইসলাম এসব অর্থহীন আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি। তাই ছবি, ভাস্কর্য নিষিদ্ধ করেছে। অধুনা যে সেলফি সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, মনোবিজ্ঞানীরা সেটাকে মানসিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সেলফি কালচারের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত ক্ষতি ছাড়াও অশ্লীলতা, নগ্নতা প্রকাশ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সহিংসতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রকাশ করে তার জীবন হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

মুসলমানের শান :

মুসলমানের শান কিরূপ হওয়া চাই। প্রকৃত ও উত্তম মুসলমান তাঁরা, যাঁদেরকে আমরা আল্লাহওয়ালা ও ওলী-আল্লাহ বলে জানি। প্রখ্যাত একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম সায়্যিদ আহমদ কবীর রেফাঈ (রহ.)। জীবনীতে আছে, তাঁর প্রতিদিনের মামুল ছিল আযান দেওয়া মাত্রই তিনি মসজিদে চলে যেতেন। সাধারণত নামাযের ২০-৩০ মিনিট আগেই আযান দেওয়া হয়। একদা তিনি লেখাপড়ার কিছু কাজ করছিলেন। বসা অবস্থায় স্বভাবতই পাঞ্জাবির দামান মাটিতে পড়ে থাকে। সেদিনও তাঁর পাঞ্জাবির দামানের পেছনের সাইটটি মাটিতে বিছানো অবস্থায় ছিল। একটি বিড়াল এসে ওই কাপড়ের ওপর বসে পড়ল এবং ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এমতাবস্থায় মুয়াযযিনের আযান। আযান শুনে তিনি তড়িঘড়ি করে কিতাব-খাতা গুছিয়ে নিচ্ছেন, এমন অবস্থায় বিড়ালের কাণ্ড দেখে তিনি হয়ে পড়লেন পেরেশান। বিড়াল ঘরোয়া জন্তু হিসেবেই বিবেচিত। সে কারণে বিড়াল সব সময় মানুষের আশপাশেই ঘুরতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে এভাবেই সে পড়ে থাকে। এই বুজুর্গ ব্যক্তি এখন চিন্তায় পড়ে গেলেন যে যেহেতু আযান হয়েছে তাই তাড়াতাড়ি মসজিদে যেতে হবে। কিন্তু তিনি উঠে পড়লে বিড়ালের ঘুম ভেঙে যাবে। এখন তিনি কী করবেন? বিড়াল একটি সাধারণ প্রাণী হলেও তাঁর চিন্তায় এল এটিও আল্লাহ তা'আলার মাখলুক। তার এরূপ আরামের ঘুম ভেঙে দেওয়া কতখানি প্রযোজ্য। একটি প্রাণী ঘুম ভাঙার কষ্টে পতিত হোক, এটিও তিনি সহ্য করবেন না। আবার আযানের ডাক। প্রতিদিনের মামুলও তিনি ছাড়তে পারবেন না। এমন অবস্থাতে তিনি কী করবেন! তিনি খুব নীরবে কাউকে দিয়ে ঘর থেকে একটি কেঁচি সংগ্রহ করলেন। আলতোভাবে পাঞ্জাবির সে অংশটি কেটে ফেললেন যাতে উক্ত বিড়াল ঘুমে বিভোর। অতঃপর মসজিদে চলে গেলেন।

মসজিদে থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন বিড়ালের ঘুম ভেঙেছে। সে চলে গেছে অন্য কোথাও। কাপড় খণ্ডটি সেখানেই পড়ে আছে। সুই-সুতা নিয়ে কাপড়টি আবার পাঞ্জাবির সাথে সেলাই করে নিলেন।

এই হলো আমাদের বুজুর্গদের শান। মানুষ তাঁদের হাতে কষ্ট পাবে, একজন মুসলমান তাঁদের কথাবার্তা বা হাতের দ্বারা কষ্ট পাবে তা তো দূরের কথা, কোনো প্রাণীও যাতে কষ্ট না পায় তার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতেন তাঁরা।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক ব্যক্তি দোকানে চিনি কিনতে গেলেন। চিনি মেপে দোকানদার প্যাকেট করে দিলে তিনি ওই প্যাকেট নিয়ে সরাসরি বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। বাড়িতে এসে দেখলেন তাতে কয়েকটি পিঁপড়া। চিন্তা এল এই পিঁপড়াগুলো তো তাদের বংশ, ভাই-বেরাদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি চিনির প্যাকেট নিয়ে দোকানে এলেন। দোকানদার তো স্বভাবতই চমকে উঠলেন। বলতে লাগলেন–কী হয়েছে ভাই? ওই চিনিতে কি কোনো সমস্যা হয়েছে? উক্ত ব্যক্তি বললেন, না না, ভাই! আপনার জিনিসের কোনো শেকায়ত নেই। সমস্যা হলো, উক্ত চিনিতে করে কিছু পিঁপড়া চলে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে তাদের নিজেদের ঘরে পৌঁছে দিতে এসেছি।

এখন চিন্তা করুন! যে সকল লোক বিড়াল এবং পিঁপড়ার আরামেরও এত গুরুত্ব দেন, তাঁদের হাতে কোনো মানুষ কষ্ট পাবে; তা কল্পনা করতে পারবেন? তাঁরাও মানুষ আর আমরাও মানুষ। আমাদের কী অবস্থা হতে চলেছে? একটু বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করা জরুরি।

হিসাবকিতাবের চিন্তা থাকলে মানুষ এমনিতেই বদলে যায় :

প্রকৃত কথা হলো, মানুষ যখন এই কথা চিন্তা করবে যে আমি যা-ই করি না কেন, আমার তো হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এর একটা পরিণতি আছে, একটা বদলা আছে। তখন তার চিন্তা হবে আমার যেকোনো কাজে যেন কারো কষ্ট না হয়। ভুলে কিছু হয়ে গেলে তখন সে নিজেই উক্ত ব্যক্তির কাছে এসে বলবে, জনাব আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে যা শাস্তি দেবেন, আমি মেনে নেব।

ভাইয়েরা, আসল বিষয় হলো, চিন্তা থাকতে হবে। ভালো কাজের বৈশিষ্ট্যই এটি। মানুষ যখনই চিন্তা করবে আমার কাজকারবার, কথাবার্তা এবং আচার-আচরণে কারো কষ্ট হচ্ছে কি না। কারো প্রতি সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে কি না। কারো প্রতি অত্যাচার হচ্ছে কি না।

এরূপ চিন্তা সকলের মধ্যে এসে গেলে ইনশাআল্লাহ সকলের জীবন বদলে যাবে। সুখ-শান্তি আমাদের সকলের সাথী হবে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব বিভাগ শান্তি ও সুখময় হবে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

তাওবা-ইস্তেগফার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহ তা'আলা দুটি বিষধর জিনিস সৃষ্টি করেছেন–নফস-প্রবৃত্তি ও শয়তান। এ দুটির কাজই হলো মানুষকে ধ্বংস ও জাহান্নামমুখী করা। পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা এ দুটির বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক তিরইয়াকও সৃষ্টি করেছেন। কারণ এটা হতে পারে না যে তিনি বিষধর জিনিস সৃষ্টি করবেন, প্রতিষেধক তৈরি করবেন না! এই প্রতিষেধকের নাম ইস্তেগফার ও তাওবা। এই প্রতিষেধক এতটাই কার্যকর পাওয়ারফুল যে এর সঠিক ব্যবহারে শয়তান ও প্রবৃত্তির বিষক্রিয়া নিমেষেই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

আরিফ বিল্লাহ আব্দুল হাই (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে গোনাহ করার সামর্থ্য দিয়েছেন তাই তো তাদেরকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যে সৃষ্টির মাঝে গোনাহ করার সামর্থ্য নেই, তাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠাননি। শয়তানের কুমন্ত্রনায় হযরত আদম (আ.) ভুলের শিকার হলেন, সাথে সাথে তিনি লজ্জিত হলেন, অনুতপ্ত হলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাঁচার উপায়ও বাতলে দিলেন। বলো,

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين

আরো বলে দিলেন, তোমাকে দুনিয়াতে পাঠানো হচ্ছে সেখানে শয়তান ও প্রবৃত্তি তোমার ও তোমার সন্তানদের পিছু ছাড়বে না। অতএব যখনই কোনো প্রবঞ্চনার শিকার হবে, তখনই তুমি এবং তোমার সন্তানরা তাওবা ও ইস্তেগফারের আশ্রয় নেবে। তাহলে গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে যাবে যে ইতিপূর্বে কোনো গোনাহই হয়নি। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

গোনাহ করে তাওবাকারী তো ওই ব্যক্তির মতো, যার কোনো গোনাহই নেই। (ইবনে মাজাহ)

রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না

কোনো কিতাবে আছে যে মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা আছে, যাদেরকে কিরামান-কাতেবীন বলা হয়। দুজনের একজন ডান পাশে থাকেন যিনি বাম পাশের ফেরেশতার আমীর। মানুষ কোনো ভালো কাজ করলে ডানের ফেরেশতা তা সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করেন, অপরজনের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আর কোনো গোনাহের কাজ করলে বামের ফেরেশতা ডানের ফেরেশতার অনুমতি ছাড়া তা লিপিবদ্ধ করতে পারেন না, কারণ তিনি তাঁর অধীনস্ত। তাই বান্দা কোনো গোনাহ করলে ডানের ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি এটা লিপিবদ্ধ করতে পারি? আমীর বলেন–না, এখন লিপিবদ্ধ করো না। হতে পারে সে তাওবা করবে। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করেন, এখন লিখতে পারি? আমীর বলেন–থামো, এখন লিখো না হয়তো তাওবা করবে। এরপর তৃতীয়বার তাকে লেখার অনুমতি প্রদান করেন।

মূলত আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা করার সুযোগ দেন যেন তার আমলনামায় গোনাহ লিপিবদ্ধ করতে না হয়। তাওবা না করার কারণে আমলনামায় গোনাহ লেখা হয়ে গেলে ও মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হওয়া পর্যন্ত তাওবা করার সুযোগ আছে, যখনই তাওবা করবে তখনই তার গোনাহের নামনিশানাও মিটিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ সর্বক্ষণ বান্দার তাওবার অপেক্ষায় থাকেন। যখন বান্দা তাওবা করবে আল্লাহ তখনই তাকে ক্ষমা করে দেবেন। ইরশাদ করেন,

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সব ধরনের গোনাহ ক্ষমা করেন।

باز آ باز آ ہر آں چہ ہستی باز آ
گرکافرو گبروبت شکستی باز آ
ایں درگہ ما درگہ نا امیدی نیست
صد بار گرتو بہ شکستی باز آ

হে বান্দা! যদি শতবার তাওবা ভঙ্গ করে থাকো তবুও আবার তাওবা করো এবং গোনাহ থেকে ফিরে এসো, তাওবার দরজা খোলা আছে, এই দরবার থেকে নিরাশ হবে না।

শয়তান ও নিরাশ হয়নি

বান্দা হয়ে নিরাশ কেন হবেন, অথচ অভিশপ্ত শয়তান ও তো আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়নি। যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিতাড়িত করেন তখন সে আল্লাহর কাছে সময় ও সুযোগ প্রদানের দরখাস্ত করে–

رب انظرنى الى يوم يبعثون

পরওয়ারদেগার! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান করেন। ইরশাদ করেন,

انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم

তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হলো।

আরে ভাই! যতক্ষণ দরজা খোলা আছে নিরাশ ও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। মাঝেমধ্যে অনেকের মনে এ ধারণার জন্ম হয় যে, আমি তো হতভাগা

কপালপোড়া, আমল করতে পারি না গোনাহে ডুবে থাকি। এ ধারণা পোষণ করতে করতে একসময় অন্তরে হতাশার কালো ছায়া ছেয়ে যায়। মনে রাখবেন! হতাশ হওয়া ও নিরাশ হওয়া শয়তানি চালের ফসল। শয়তান মানুষকে নিরাশার সাগরে ডুবিয়েই বেআমল বানায়। নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। দরকার শুধু চোখের দুই ফোঁটা পানি। বান্দার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ার আগেই আল্লাহর রহমতের দরিয়া বয়ে যাবে। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যখন ফেরাউন ডুবতে ছিল তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) খুব দ্রুত তার মুখ কাদা দ্বারা ভরে দেন। পরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুসা! তোমার সামনে আমার এক বান্দা ডুবে মরতেছিল তা দেখেও কি তোমার মাঝে দয়ার উদ্রেক হয়নি? কিন্তু আমার রহমতের দরিয়া অপেক্ষা করতে ছিল, তখনও যদি ফেরাউন আমার সাহায্য চাইত আমি তাকে নাজাত দিতাম।

শয়তানের জন্যও তাওবার দরজা খোলা

হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে একবার শয়তানের সাক্ষাৎ হলে সে মুসা (আ.)-কে বলল, মুসা! তুমি তো কালীমুল্লাহ, তূর পর্বতে যাচ্ছ আল্লাহর সাথে কথা বলতে, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর তুমি আল্লাহর কাছ থেকে জেনে নিও। হযরত মুসা (আ.) বলেন, আচ্ছা, বলো তোমার কী প্রশ্ন? সে বলল, আমার মতো অভিশপ্তের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবার দরজা খোলা আছে কি না? তাওবা করে আমি মকবুল হতে চাই! হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে এই প্রশ্ন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুসা! তাওবার দরজা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য উন্মুক্ত, শয়তান যদি এখনও তাওবা করে তাহলে তা অবশ্যই কবুল করা হবে। তাকে গিয়ে বলো, আদমের কবরে সিজদা করতে এটাই তার তাওবা। দেখুন! আল্লাহ তা'আলা শয়তানের জন্যও মাগফিরাত ও তাওবার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু ওই অভিশপ্ত উত্তর দিল, যাকে জীবদ্দশায় সিজদা করিনি তাকে মৃত অবস্থায় কিভাবে সিজদা করব?

সর্বোত্তম গোনাহগার

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

كل بنى آدم خطاء و خير الخطائين التوابون

গোনাহ তো সবাই করে তবে যারা গোনাহের পরে তাওবা করে তারাই উত্তম। (তিরমিযী) এ হাদীস থেকে বুঝে আসে, গোনাহ হবে, গোনাহের পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি হবে তবে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। বেশি বেশি তাওবা করলে শয়তানের চাল-কুমন্ত্রনাও কমে আসবে। মনে রাখবেন! গোনাহ হয়ে যাওয়া গোনাহের কাজ করা দূষণীয় নয়, তাওবা না করাটা হলো বড় ফিতনা দূষণীয় ব্যাপার। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

لو انكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم

তোমরা যদি গোনাহমুক্ত হয়ে যাও তবে আল্লাহ এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহ করবে আর আল্লাহ তাদের গোনাহ ক্ষমা করবেন। (মুসলিম-২৭৪৮)

সমস্যার সমাধানে

হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করল, হযরত! বৃষ্টি হচ্ছে না বৃষ্টির প্রয়োজন, একটু দু'আ করুন। তিনি বললেন, ইস্তেগফার করো। আরেকজন এসে বলল, আর্থিক সংকটে আছি, দু'আর দরখাস্ত। তিনি বললেন, ইস্তেগফার করো। তৃতীয় ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর আমি নিঃসন্তান সন্তান হওয়ার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, ইস্তেগফার করো। উপস্থিত একজন প্রশ্ন করলেন, হযরত আপনি প্রত্যেকের উত্তরে একই কথা বললেন, 'ইস্তেগফার করো', কারণ কী? হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আরে আমি নই, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারীমে সব সমস্যার সমাধান ইস্তেগফার দ্বারা করতে বলেছেন। ইরশাদ করেন,

استغفروا ربكم انه كان غفارا- يرسل السماء عليكم مدرارا- ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا-

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দেবেন। (সূরা নূহ-১০-১২)

এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب

যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তা'আলা তার সব ধরনের সংকট, অভাব-অনটন এবং দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেবেন এবং তাকে অকল্পনীয়ভাবে রিযিক দান করবেন। (আবু দাউদ, হা. ১৫১৮)

এ হাদীসে গোনাহগারদের জন্য বড় সান্ত্বনার বাণী রয়েছে যে, মুত্তাকীগণ তাকওয়ার কারণে যেসব নেয়ামতরাজি পেয়ে থাকেন গোনাহগাররাও তাওবা-ইস্তেগফারের বদৌলতে সেসব নেয়ামত লাভ করতে পারে। ইরশাদ করেন,

ان الله يحب التوابين

আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীদের পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বেশি বেশি তাওবা করে তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

বিভিন্ন গোমরাহ দল : উলামায়ে কেরামের করণীয়

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

(গত সংখ্যার পর)

(গত মার্চ ২০১৪ ইং মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক্ব সাহেবের মূল্যবান বয়ানের দ্বিতীয় কিস্তি।)

এখন আসুন জেনে নিই, তাকলীদ কী জিনিস? তাকলীদের হাকীকত কী? তাকলীদ কখন থেকে শুরু হয়েছে? তাকলীদের ব্যাপারে কোনো আপত্তি আছে কি না?

তাকলীদ হলো কোনো মুজতাহিদের ওপর আস্থা রেখে, তার কথাকে মেনে নেওয়া। তবে কোনো নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব। এই তাকলীদ আমরা প্রত্যেকেই করছি। দ্বীন হোক আর দুনিয়া হোক। স্বাস্থ্য খারাপ হলে ডাক্তারের পরমর্শ নিই, এ হিসেবে আমরা ডাক্তারের তাকলীদ করলাম। বিল্ডিং তৈরির জন্য ইঞ্জিনিয়ারের দিকনির্দেশনা ফলো করি, এ হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারের তাকলীদ করলাম। মামলা-মোকাদ্দমায় অ্যাডভোকেটের তাকলীদ করি। আর দ্বীনের জটিল বিষয়ে হানাফী মাযহাবের তাকলীদ হচ্ছে, নিজের মতের ওপর আমল না করে তাবেঈনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম যিনি ছিলেন, তাঁর কথার ওপর আমল করা। দ্বীনের ওপর চলার জন্য এটি সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা। আপনারা জানেন, বিশেষ করে যারা উলূমুল হাদীসের ছাত্র তারা তো অবশ্যই জানে যে সমস্ত সাহাবীর ইলম ছয়জন সাহাবীর মধ্যে জমা হয়েছিল। আর সেই ছয়জনের ইলম দুজনের মধ্যে ১. হযরত আলী (রা.) ২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)। আর এই দুই সাহাবীর ইলম দুজন তাবেঈর মাঝে জমা হয়েছিল। তাঁরা হলেন আলক্বামা ও আলআসওয়াদ। আর আলক্বামা ও আলআসওয়াদের ইলম ইবরাহীম নাখঈর মাঝে, ইবরাহীম নাখঈর ইলম হাম্মাদের মাঝে, আর হাম্মাদের ইলম ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাঝে জমা হয়েছিল। তাহলে এটা প্রমাণিত হলো যে সোয়া লক্ষ সাহাবার ইলম আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাঝে জমা করেছেন সুবাহানাল্লাহ! এ জন্য আবু ইউসূফ (রহ.) নিজেই স্বীকার করেছেন যে আমরা শত তালাশের পর হাদীস জমা করে তাঁর সামনে উপস্থিত করতাম আর ভাবতাম যে এই হাদীসগুলো হয়তো তিনি জানেন না। কিন্তু আশ্চর্য! হাদীসগুলো পেশ না করতেই তিনি হাদীসের পূর্ণ তাফসিলী আলোচনা আমাদের শুনিয়ে দিতেন : এটি অমুক সাহাবী থেকে বর্ণিত, এটির সনদ সহীহ, ঐটির সনদ যয়ীফ ইত্যাদি। আবু ইউসূফ (রহ.) বলেন যে আমরা অনেক খুঁজেও এমন কোনো নতুন হাদীস পেশ করতে পারিনি, যা আবু হানীফা (রহ.)-এর ইলমে নেই। তো দ্বীনের জটিল বিষয়ে নিজের বুঝমতো না চলে আবু হানীফা (রহ.)-কে অনুসরণ করা কি বেশি নিরাপদ নয়? আর এই কাজটিই চার মাযহাবওয়ালারা করছেন। এই চার মাযহাবের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। হ্যাঁ, আপসে ছোটখাটো মতভেদ থাকতে পারে তবে সেগুলো আক্বীদাবিষয়ক ইখতিলাফ নয়। বরং চার মাযহাবের সবাই আক্বীদার বিষয়ে হানাফী মাযহাবের লেখা 'আকীদাতুত তাহাবী' পড়ে।

একটি ঘটনা :

একবার বাগদাদের খলীফা ইমাম মালিক (রহ.)-কে প্রস্তাব করলেন যে আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে আপনার 'মুআত্তা' কিতাবকে আমার শাসনাধীন এলাকাগুলোতে বাধ্যতামূলক করতে চাই। শুধু আপনি অনুমতি দিলেই হয়। ইমাম মালিক (রহ.) জবাবে বললেন, জনাব! এটা ঠিক হবে না। কারণ আমার মাযহাব পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা, অর্থাৎ আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মরক্কোর লোকেরা অনুসরণ করে। ওদিকে সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈ (রহ.) এবং কুফায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর শাগরেদগণ আছেন। সুতরাং আপনি যদি এটাকে বাধ্যতামূলক করেন, তাহলে বিরাট ফিতনা সৃষ্টি হবে; মানুষের মাঝে বিভেদ ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আপনি এ কাজ কখনোই করবেন না। (সিয়ারু আলামিননুবালা ৭/১৪২)

লোহিত সাগরের পশ্চিমে ইমাম মালেক (রহ.)-এর এক শাগরেদ ছিলেন ইয়াহয়া ইবনে ইয়াহয়া। তাঁর মুআত্তার নূসখা আমরা পড়ি। তাঁর মাধ্যমে ওই এলাকায় ইমাম মালিকের মাযহাব চালু হয়েছে। তাহলে ইমাম মালিক কি অন্য ইমামদের প্রতি সৌহার্দ্য দেখালেন না? মাযহাবওয়ালারা একে অপরকে যে মোহাব্বত করতেন সে সম্পর্কীয় আরো কিছু ঘটনা আপনাদেরকে সামনে শোনাব ইনশাআল্লাহ। উনারা একে অপরকে গোমরাহ বলা তো দূরের কথা, কেউ কাউকে কখনো ফাসেকও

বলেননি। সবাই তো হক্বের ওপর আছেন, কে কাকে না হক্ব বলবেন?! আর এই আহলে হাদীসরা আমাদেরকে গোমরাহ বলছে! বেঈমান বলছে!! নাউযুবিল্লাহ।

একবার হানাফী মাযহাবের এক বড় আলেম কোনো কাজে শাফেঈদের এলাকাতে গেল। মুআযযিন নসাহেব তাকে দেখে ইকামাতের শব্দগুলো দুবার করে বললেন। অথচ শাফেঈ মাযহাবের নিয়ম হলো, ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলা। শুধু এতটুকুই না বরং তাকে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। জনাব! আপনি মেহমান, আপনি আমাদের ইমামতি করেন। আর উনিও আজীব রি'আয়াত করেছেন। তিনি ক্বিরাত পড়তে গিয়ে বিসমিল্লাহ জোরে পড়লেন। অথচ হানাফী মাযহাবে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তে হয়। উনি চিন্তা করেছেন, যেহেতু পুরো এলাকায় শাফেঈ সুতরাং তাদের মাঝে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা বা ভুল বোঝাবুঝি না হয়। কারণ শাফেঈ মাযহাবে বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ। আর ফাতেহা যেহেতু জোরে পড়তে হবে সেহেতু বিসমিল্লাহও জোরে পড়তে হবে। এখানে হানাফী মাযহাবের ওই আলেমের আচরণে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?

খোদ ইমাম শাফেঈ (রহ.) যখনই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কবর যিয়ারতের জন্য কূফা নগরীতে আসতেন, তখন ফযরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। লোকেরা আপত্তি করল যে হুজুর!! আপনার মাযহাব কোথায় গেল? তিনি উত্তরে বললেন, আমার মাযহাব ঠিকই আছে; কিন্তু যেই ইমামের উসূল নিয়ে আমরা চলি তাঁর এলাকায় এসে আমরা আমাদের মাযহাব কায়েম করাকে বেয়াদবি মনে করি। সুবাহানাল্লাহ

শাখাগত মাসআলায় মতপার্থক্য কখনই ফেতনার কারণ হয়নি; বরং পরস্পরে এভাবেই মিল-মোহাব্বতের সাথে জীবন যাপন করে আসছে।

তারা প্রশ্ন করতে পারে, নবীজির যামানাতে কি তাকলীদ ছিল? সাহাবীদের যামানাতে কি তাকলীদ ছিল? এগুলো তারা জোর গলায় বলবে। আপনারা উত্তর দেবেন, হ্যাঁ, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে)-এর যামানাতে তাকলীদ ছিল। তার প্রমাণ : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর যামানায় যতগুলো এলাকা বিজিত হয়েছিল তার প্রতিটিতেই নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন করে গভর্নর পাঠিয়ে ছিলেন। এবং প্রতি এলাকার অধিবাসীদের নিযুক্ত গভর্নরকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা কখনোই বলেননি যে সমস্যায় পড়লে মদীনায় এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক আনসারী যুবককে ইয়েমেনে পাঠালেন। তার নাম হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, ফকীহুল আনসার। পাঠানোর সময় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠাচ্ছি। তুমি ওই এলাকার লোকদের দ্বীন শিক্ষা দেবে এবং তারা তোমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে করে চলবে। তো তুমি তাদের কিভাবে ফায়সালা দেবে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি তাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে ফায়সালা দেব। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি কোরআনে না পাও? তিনি উত্তর দিলেন, তাহলে হাদীসের মাধ্যমে ফায়সালা দেব। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, যদি হাদীসেও না পাও? তিনি বললেন, اجتهد برأى আমি কোরআন-হাদীস থেকে কিয়াস করে মাসআলা বের করব। তার এই উত্তর শুনে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হয়ে গেলেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

الحمدلله الذى وفق رسول رسول الله بالحق

সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে সহীহ জিনিস বোঝার তাওফীক দান করেছেন (মুসনাদে আহমাদ : ২২০৬১)। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ইয়েমেনের সব লোকেরা কি এই সাহাবীকে অনুসরণ করেনি? আর এটা 'মুতলাক তাকলীদ' ছিল না 'তাকলীদে শাখসী' ছিল? অবশ্যই এটা তাকলীদে শাখসী ছিল, অর্থাৎ নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ।

'আমর ইবনে হাযম (রা.)-কে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাজরান এলাকায় পাঠিয়েছিলেন এবং ওই এলাকার লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন যে তোমরা এই সাহাবীকে অনুসরণ করো (সুনানে আবি দাউদ : ৩৫৯২)। এভাবে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যত এলাকায় গভর্নর পাঠিয়েছিলেন প্রতিটি এলাকার লোকদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে তোমরা নিজ এলাকার গভর্নরকে অনুসরণ করো।

অনুরূপ একবার বাহরাইন এলাকা থেকে কিছু লোক জানাল যে হুজুর! আমাদের একজন মু'আল্লিম দিন, যিনি আমাদের ইসলাম ও আপনার সুন্নাত শিক্ষা দেবেন। লক্ষ করুন! 'হাদীস'-এর শব্দ হলো يعلمنا الإسلام وسنتك এখানে 'হাদীস' নয় বরং 'সুন্নাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ 'হাদীস' ও 'সুন্নাত' এক বিষয় নয়। সময় পেলে পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রা.)-কে দিয়ে বললেন, একে নিয়ে যাও। সে এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতদার। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বললেন, সে যা করে তোমরা তা-ই করো। আমার কাছে আসার কোনো দরকার নেই (মারাসিলে আবি দাউদ :

২৫৭)। একেই বলে 'তাকলীদে শাখসী'। একেবারে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনুসরণ করা। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানা অতিক্রান্ত হলো। এরপর এলো খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানা। খোলাফাদের পক্ষ থেকে প্রতিটি শহরে একজন মুফতী, অর্থাৎ ফকীহ সাহাবী নিযুক্ত করা হলো এবং ওই শহরের লোকদেরকে হুকুম দেওয়া হলো, তারা যেন উক্ত মুফতী সাহাবীকে অবশ্যই অনুসরণ করে। সে মতে মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে, মদীনার হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-কে এবং কুফায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মুফতী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে প্রতিটি শহরে একজন মুফতী ছিলেন। আর ওই এলাকার লোকেরা এমনভাবে তাকলীদে শাখসী করত যে এক শহরের লোক অন্য শহরের মুফতীকে অনুসরণ করত না। বরং তাদের মুফতী সাহেব যা বলতেন শুধু তা-ই আমল করত।

একবার মদীনার একদল লোক মক্কায় হজ করতে এল। তাদের সব কাজ শেষ শুধু বিদায়ী তাওয়াফ বাকি। এরই মধ্যে তারা একটি সমস্যায় পড়ে গেল। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বেই তাদের এক মহিলার মাসিক শুরু হয়েছে; এখন তারা কিভাবে দেশে ফিরবে? এ ক্ষেত্রে তাদের মুফতী সাহেবের ফাতওয়া ছিল, সে অপেক্ষা করবে এবং মাসিক শেষ হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করবে। এই ফাতওয়া অনুযায়ী তাদের দেশে ফিরা বিলম্বিত হয়ে যায়। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে মক্কার মুফতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর! এখন আমাদের করণীয় কী? তিনি ফাতওয়া দিলেন যে ওই মহিলার বিদায়ী তাওয়াফ মাফ। তোমরা তাকে নিয়ে চলে যাও। তারা আপত্তি জানাল, হুজুর! আপনি তো যেতে বলছেন; কিন্তু মদীনার মুফতী সাহেব তো অনুমতি দেন না...। (সহীহ বুখারী : ১৭৫৮)

এসব থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরা তাকলীদে শাখসী তথা ব্যক্তি তাকলীদকে কতটা গুরুত্ব দিতেন।

এই যে পদ্ধতি অর্থাৎ 'তাকলীদে শাখসী' এটা কি কোনো নির্দিষ্ট এলাকার সাথে খাছ ছিল? না। গোটা মুসলিম জাহানেই এর প্রচলন ছিল। রাসূল (সা.)-এর যামানা থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি যুগের উলামাগণ তাকলীদের ওপর আমল করাই এ কথা প্রমাণ করে যে তাকলীদ ওয়াজিব। সুতরাং দ্বীনের ওপর চলতে হলে চার মাযহাবের যেকোনো একটিকে অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য জরুরি।

কারণ চার ইমাম নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফায়সালা, খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত মুফতী সাহেবগণের ফাতওয়া ও ফায়সালাগুলোকে সামনে রেখেই জীবনের সকল অধ্যায়ের সমাধান দিয়েছেন। এক কথায় চার ইমাম যখন ফায়সালা দিয়েছেন, তখন তাঁদের সামনে কোরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং মুফতী সাহবায়ে কেরামের ফায়সালাসমূহ লিখিত আকারে সামনে ছিল। এর ভিত্তিতে তাঁরা সম্ভাব্য মাসআলাসমূহের একটি ফায়সালা দিয়ে গেছেন। ইমাম তো আরো বেশি ছিলেন। যেমন : ইমাম 'আওযাঈ' (রহ.), মালিক (রহ.)-এর সাথী ইমাম লায়ছ ইবন সা'দ (রহ.)। যিনি যোগ্যতায় ইমাম মালিক (রহ.)-এর চেয়ে কম ছিলেন না। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, ليث ليس أقل من مالك লাইছ, মালিকের চেয়ে কম যোগ্য নয় (সিয়ারু আলামিল নুবালা, ইমাম যাহাবী : ৭/২১৬)। বরং তিনিও একজন ইমাম। কিন্তু এ সকল ইমামের মাযহাব স্থায়ী হয়নি। কারণ পুরো জীবনে যত মাসআলা দরকার সব বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত দেননি। এ জন্য তাঁদের মাযহাব কিছুদিন পর লুপ্ত হয়ে গেছে। আর যাঁরা সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন তাঁদের মাযহাবই স্থায়ী হয়েছে। এসবই আল্লাহর পাকের ইচ্ছা! তো আমি হাদীস এবং বাস্তবসম্মত উদাহরণ দ্বারা মাযহাব ও তাকলীদকে আপনাদের সামনে স্পষ্ট করার চেষ্টা করলাম।

হাদীসে শরীফে এসেছে,

رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

(সহীহ ইবনে হিব্বান : ৬৬)। অন্য হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ

(মুসনাদে হুমাইদি : ৮৮)।

আমার উম্মতের মধ্যে অনেকে মুহাদ্দিস হবে, কিন্তু তারা ফকীহ হবে না। গুরুত্ব সহকারে লক্ষ করুন! এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, সকল মুহাদ্দিস ফকীহ হবে না। কিন্তু যে ফকীহ সে অবশ্যই মুহাদ্দিস। উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে। যেমন :'কুতুবে সিত্তাহ' এর সংকলকগণ কেউ ফকীহ ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, সবাই মুহাদ্দিস ছিলেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ইমাম বুখারী (রহ.) এত মাসআলা ইস্তিম্বাত করলেন, তাহলে তিনি কি ফকীহ নন? আমি বলব যে হ্যাঁ, তিনি ফকীহ। তবে তিনি فقيه من المحدثين। অর্থাৎ তিনি فقيه من الفقهاء ছিলেন না। তবে অন্য মুহাদ্দেসীনদের তুলনায় তাঁর তবীয়তে ইস্তিম্বাত বেশি ছিল। তাই বলে তাঁকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতো ইমামদের সাথে তুলনা করলে চলবে না। কারণ উভয় শ্রেণীর মাঝে রয়েছে আসমান-জমিন ফারাক। হযরত ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)ও অনেক বড় ফকীহ ছিলেন। তাঁর ফাতওয়ার কিতাবের নাম- مجموعة فتاوى ابن تيمية। কিন্তু থানভী (রহ.) মাজালিসে হাকীমুল উম্মাহ নামক কিতাবের এক স্থানে বলেছেন, তিনি ফকীহ ছিলেন ঠিক, কিন্তু তাঁকে অথবা ইমাম বুখারীকে যদি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে একজন মক্তবের ছাত্র এবং অপরজন শায়খুল হাদীস। এরপর থানভী (রহ.) ইমাম

আবু হানীফা (রহ.)-এর ইস্তিম্বাত এবং তাঁদের ইস্তিম্বাতের স্বরূপ তুলে ধরেছেন!!

সুতরাং উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে ফকীহর প্রয়োজন বেশি। তাই ফকীহ তৈরি করতে হবে; দারুল ইফতা খুলে হাদীসপড়ুয়া ছাত্রদের মুফতী হিসেবে তৈরি করতে হবে। এক হাদীসে এসেছে–

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّمَاالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ،وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّه

(আলমুজামুল কাবীর, তবারানী : ৯২৯)

অর্থাৎ ইলম বলা হয় যা উস্তাদের কাছ থেকে শেখা হয়। শুধু স্টাডি করার নাম ইলম নয়। আপনাকে মুতা'আল্লিম হতে হবে। আর ফিকহ বলা হয় একজন বিজ্ঞ ফকীহের সোহবতে থেকে

কোরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা। আপনারা ভালো করেই জানেন, সমুদ্রের দুটি স্তর। উপরের স্তর থেকে জেলেরা মাছ ধরে। আর তলদেশ থেকে ডুবুরিরা মণি-মুক্তা আহরণ করে। তেমনি ইলম একটি সমুদ্রের মতো। মুহাদ্দিসগণ উপরের স্তর থেকে হাদীসের জাহেরী অর্থ নিচ্ছেন। আর ফকীহগণ সমুদ্রের গভীর থেকে মাসআলা-মাসায়িল ইস্তিম্বাত করছেন।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদীস দ্বারা ফিকহের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে এর দ্বারা এও প্রমাণিত হলো যে একা গবেষণা করলে তা ইলম হবে না। যেমন : মওদুদীর গবেষণা ইলম নয়। এমনিভাবে ডা. জাকির নায়েকের লেকচারও ইলম নয়। কারণ তাঁরা কোনো বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সোহবাত অর্জন করেননি। ফলশ্রুতিতে ডাক্তার দিচ্ছেন ফাতওয়া আর মওদুদী সাহেব প্রফেসরদের তাফসীর করতে বলেছেন। মা'আযাল্লাহ

অন্য হাদীস দ্বারাও এ কথা বোঝা যায়,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

(সুনানে আবি দাউদ : ৩৬৪১)

'উলামারা নবীদের ওয়ারিশ।' নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়ারিশ শব্দ কেন ব্যবহার করলেন? এর সমর্থক কোনো শব্দও তো বলতে পারতেন? যেমন : العلماء خلفاء الأنبياء। এটা বলার পেছনে হিকমত আছে। একটা হিকমত আগেই বলেছি যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা রেখে গেছেন আমরা সবগুলোরই ওয়ারিছ। শুধু মাদরাসায় পড়ালে হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি শুধু তা'লীম রেখে গেছেন? শুধু দাওয়াত রেখে গেছেন? নাকি শুধু তাযকিয়া রেখে গেছেন? বরং তিনি সবগুলোই রেখে গেছেন। সুতরাং ওয়ারিছ হতে হলে সবগুলোকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

আরেকটি হিকমত হলো, দুনিয়াতে ওরাছত দাবি করতে হলে বলতে হয় যে আমি তার ছেলে বা আমি তার ভাতিজা। মিরাছ দাবি করতে গেলে নসবনামা বলতেই হবে। তো নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে যে কেউ আমার ওয়ারিশ দাবি করবে তাকে নসবনামা বয়ান করতে হবে যে সে কার কাছ থেকে শিখেছে? এবং তার পূর্বসূরি কে ছিলেন? এভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সিলসিলা বয়ান করতে হবে। যে বয়ান করতে পারে সেই গ্রহণযোগ্য আলেম। অন্যদিকে যে বয়ান করতে পারে না, সে কোনো আলেমই না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতকে একটা দিকনির্দেশনা শিখিয়ে গেলেন। সুতরাং যেই বয়ান কিংবা তাফসীর করতে আসবে তাকে বলা হবে, আপনি সনদ বয়ান করুন। আপনার উস্তাদ কে? তার উস্তাদ কে? এভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সিলসিলা বয়ান করুন। যদি সে বলতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে লোকটি ভুঁইফোড়। ইলমী জগতে তার মা-বাপ নেই। সুতরাং তার বয়ান শোনা যাবে না। এটাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা!

আমি যেই হাদীসটি পড়েছিলাম–

رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيه

(মুসনাদে হুমাইদি : ৮৮) এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে সমাজে একজন ফকীহের গুরত্ব অপরিসীম; অথচ আহলুল হাদীসরা বলছে, এর কোনো প্রয়োজনই নেই। এ থেকেই বোঝা যায় তারা একদিকে বুখারী শরীফ বগলে রাখে অন্যদিকে সুযোগ পেলেই সহীহ হাদীসকেও অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন।

মোটকথা, ফকীহ লাগবেই। অন্যথায় পুরা সমাজব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। আপনারা সুলাইমান আল আ'মাশ (রহ.)-এর ঘটনা জানেন। তাঁর কাছে এক লোক এসে ফাতওয়া চাইলে আ'মাশ (রহ.) আবু হানীফা (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ আবূ ইউসুফকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আবূ ইউসূফ (রহ.) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে দিলেন। আ'মাশ (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তুমি কোন হাদীসের ভিত্তিতে উত্তর দিলে? আবূ ইউসূফ (রহ.) বললেন, উস্তাদজি! আপনি গতকাল যে হাদীসটি বলেছিলেন, ওই হাদীসেই তো এই বিষয়টির সমাধান রয়ে গেছে। আ'মাশ (রহ.) দেখলেন যে আসলেই তো বিষয়টি তাই। তিনি স্বীকার করে নিলেন এবং সাথে এই স্বীকৃতিও দিলেন যে أنتم الأطباء ونحن الصيادلة "তোমরা ফকীহগণ হলে ডাক্তার আর আমরা মুহাদ্দিসরা হলাম ওষুধ বিক্রেতা।" হাদীসের মধ্যে কী মাসআলা আছে আমরা সেগুলো বের করতে পারি না। (মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা, ইমাম যাহাবী : ১/৩৫)

আরেকজন মুহাদ্দিসের ঘটনা। তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ। নাম ইয়াযিদ ইবনে হারুন। তিনি এক মজলিসে বসা। সেখানে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনি (রহ.)-এর মতো বড় বড়

আলেমও উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলে ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রহ.) ধমক দিয়ে বললেন, আমাদের কাছে কেন এসেছ? আহলুল ইলমের কাছে যাও। তারা তোমাদেরকে এর সমাধান বলে দেবে। আমরা তো আহলুল হাদীস। তখন আলী ইবনুল মাদীনি বললেন, হুজুর! আপনার কাছে বসা এ সকল বড় বড় আলেম কি আহলে ইলম না? তিনি বললেন, তোমরা কোথায় আহলে ইলম; তোমরা হলে আহলুল হাদীস; হাদীস বিশারদ। মনে রাখবেন! এটা ঢাকা বংশালের আহলে হাদীস না যে হাদীসের কিছুই জানে না, কিন্তু দাবি করে আমরা হাদীস বিশারদ। আরে ভাই! আহলুল হাদীস তো ওই ব্যক্তি, যে লক্ষ লক্ষ হাদীস জানে; হাদীসের জরাহ-তাদীল ও সহীহ-যয়ীফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে। ইমাম বুখারী আহলুল হাদীস। অন্যথায় বংশালের সুইপার, ঝাড়ুদার, রিকশাওয়ালা–সবাই আহলুল হাদীস হয়ে যাবে!

যাহোক, ইয়াযীদ ইবনে হারুন বললেন, তুমি আবু হানীফা (রহ.)-এর শাগরেদদের কাছে যাও। তারাই আহলুল ইলম; তারাই ফাতওয়া দেবে। কারণ তারা ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাহলে যিনি এত বড় মুহাদ্দিস, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের মতো জগদ্বিখ্যাত আলেমদ্বয়ের উস্তাদ। তিনি ফাতওয়া দিচ্ছেন না। ফাতওয়া দেওয়ার জন্য পাঠাচ্ছেন আবু ইউসূফ (রহ.)-এর কাছে। তাহলে মুফতীর দরকার আছে কি না? স্বয়ং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সব মুহাদ্দিস ফকীহ হয় না, ফকীহ আলাদাভাবে তৈরি করো। কিন্তু আহলে হাদীসরা বলছে যে মুফতীর দরকার নেই। তাহলে তারা কি হাদীস মানে, না বরং হাদীস অস্বীকার করে? কাজেই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, প্রত্যেকটি ফকীহ মুহাদ্দিস। কিন্তু প্রত্যেক মুহাদ্দিস ফকীহ না। এই যে হাদীসের কিতাবসমূহে এত রাবী, সবাই কি ফকীহ? কখনোই না। এ জন্যই তাদের বর্ণনায় এত গরমিল। খোদ বুখারী শরীফের মতনের মধ্যেও অনেক ভুল আছে। যদিও সনদ সহীহ। আমি যখন পড়াই তখন ছাত্রদেরকে ভুলগুলো ধরিয়ে দিই। বুখারীর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুফাতে ১৪ দিন ছিলেন। কিন্তু এটা ভুল। আসলে তিনি ২৬ দিন ছিলেন। তো সনদ সহীহ, মতন ভুল। আরেক রেওয়ায়াতে আছে, যখন 'শাম দেশ' থেকে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর খবর এল...এটা ভুল। আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর খবর আসেনি, বরং তাঁর ছেলের মৃত্যুর খবর এসেছে। এরপর যুল ইয়াদাইনের হাদীস বুখারীর এক জায়গাতে আছে إحدى صلاة العشاء যার অর্থ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন মাগরিব বা এশার নামাযে ভুল করলেন। এটা সঠিক না বরং হবে إحدى صلاة العشى যার অর্থ জোহর বা আসর। এ রকম বহু জায়গাতে মতনের ভুল আছে। এমনকি বুখারী (রহ.) নিজেও এক জায়গায় সনদ বয়ান করতে গিয়ে ভুল করেছেন। লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা। অথচ বুহাইনা তাঁর মায়ের নাম। তিনি ভুল করে দাদা বানিয়ে দিয়েছেন। তাই বুখারীকে তারা যেভাবে বড় করে দেখায় সেটা ঠিক না। হ্যাঁ,

এটা ঠিক আছে যে, সব হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটা তুলনামূলক বেশি সহীহ। তার অর্থ এটা নয় যে এর মধ্যে কোনো ভুলই নেই। এ ছাড়া বুখারীতে প্রচুর পরিমাণে মানসূখ হাদীস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি 'কিতাবুল গোসল'-এ একটি হাদীস নিয়ে এসেছেন; যেখানে বর্ণিত হয়েছে : সহবাস হয়েছে; কিন্তু বির্যপাত হয়নি, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু ওজু করতে বলেছেন (হা. ২৯২)। অথচ অন্য হাদীসে আছে,

إِذَاالْتَقَيالْخِتَانَانِ فَقَدْوَجَبَ الْغُسْلُ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

فَعَلْتُهُأَنَاوَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَاغْتَسَلْنَا

(সুনানে ইবনে মাজা : ৬০৮) তাহলে এই হাদীস বুখারীতে আসল কোত্থেকে? বুখারীর আরেক স্থানে আছে,

وَإِذَاصَلَّى جَالِسًا،فَصَلُّواجُلُوسًاأَجْمَعُون

(হা. ৬৮৮) কোনো কারণে তোমাদের ইমাম বসে বসে নামায পড়ে, তাহলে তোমরাও বসে ইক্তিদা করো। অথচ এটা কি জায়েয আছে? বুখারী (রহ.) এই হাদীসটি ৬ বার এনেছেন অথচ সব মানসূখ। কারণ, মরযে ওয়াফাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার জোহরের নামায বসে পড়িয়েছিলেন। কিন্তু কোনো সাহাবীগণ বসে ইক্তিদা করেননি। এতে বোঝা যায় এই হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। এরপর কিতাবুল জানায়েযেও ৬টি স্থানে একটি মানসূখ হাদীস এনেছেন, তোমরা কোনো লাশ যেতে দেখো দাঁড়িয়ে যাও (হা. ১৩০৭-১৩১২)। অথচ অন্য রেওয়ায়েত এসেছে,

أَمَرَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ,ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَذَلِكَ , وَأَمَرَنَابِالْجُلُوسِ

ইসলামের শুরু যামানাতে আমাদেরকে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল; কিন্তু পরে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আগের হাদীসটি মানসূখ। এখন আমরা আহলে হাদীসদেরকে বলব যে যে কেউ আহলে হাদীস দাবি করবে, তাকে ১১টি বিয়ে করতে হবে। আর যত মানসূখ হাদীস আছে, সবগুলোর ওপর আমল করতে হবে। একবার হুজুর! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো সমস্যার কারণে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন। তো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কি সুন্নাত? আহলে হাদীসরা বলবে সুন্নাত। এক আহলে হাদীস এ কথা বলেছেন! তো তার এই ফাতওয়া শুনে একজন

মুসল্লী প্রশ্ন করেছে, হুজুর!! এটা পুরুষের জন্য না মহিলাদের জন্য! এ কথা শুনে আহলে হাদীস আলেম লা জওয়াব!!

একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নাতনি হযরত যায়নাবের মেয়েকে কাঁধে করে নামায পড়েছেন (সহীহ বুখারী : ৫১৬)। তো তারা কি নাতনি কাঁধে করে নামায পড়ে? হুজুর! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মোহর ছাড়া বিবাহ করেছেন। কিন্তু তারা কি মোহর ছাড়া বিবাহ করে? কোথায় তারা হাদীস মানে? আসলে এসবই তাদের ধোঁকাবাজি।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মাঝে পার্থক্য আছে এবং এও প্রমাণিত হলো যে ফকীহের মাকাম অনেক ওপরে। হাজার মুহাদ্দিসীনের মধ্যে দু-চারজন ফকীহ হয়। বিশেষ করে যারা উলূমুল হাদীসের ছাত্র তারা পড়েছে যে যদি দুই রাবীর রেওয়ায়াতের মাঝে মতভেদ হয়, আর তাদের একজন ফকীহ এবং অপরজন শুধু মুহাদ্দিস; তাহলে ফকীহের রেওয়ায়াত প্রাধান্য পাবে। কারণ মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো মতনের মধ্যে বেশকম করে ফেলেন। যে কারণে রেওয়াতের মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে যায়। এটা হলো ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মাঝে পার্থক্য।

তদ্রূপ হাদীস ও সুন্নাতের মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। হাদীসের কিতাবে যা আছে সব হাদীস। কিন্তু সবগুলো সুন্নাত না। এখান থেকে বাছাই করে দেখতে হবে, যেগুলোর মধ্যে সুন্নাত হওয়ার ৪ শর্ত পাওয়া যায় সেগুলো সুন্নাত এবং হাদীস। আর যেগুলোর মধ্যে উক্ত শর্তসমূহ পাওয়া যায় না সেগুলো হাদীস বটে; কিন্তু সুন্নাত না।

১. যেগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

২. যা মানসূখ বা রহিত হয়নি।

৩. যেটা নবীজি কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা জায়গার সাথে খাস না।

ব্যক্তির সাথে খাস। যেমন :

مَنْ شَهِدَلَهُ خُزَيْمَةُأَوْشَهِدَعَلَيْهِ فَحَسْبُه

(আলমুজামুল কাবীর, তবারানি: ৩৭৩০)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুযাইমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, কারো সাক্ষীর ব্যাপারে সে একাই যথেষ্ট।

আরেক সাহাবীর ঘটনা। তিনি বকরী তাকসীম শেষে দেখলেন একটি মাত্র বকরি বাকি আছে। কিন্তু এটার বয়স ১ বছরও না যে সেটি দিয়ে কুরবানী হয়। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দিয়ে বললেন, এটি শুধুমাত্র তোমার জন্য। অন্য কারো জন্য জায়েয হবে না (সহীহ বুখারী : ৫৫৪৭)। এটা তাঁর জন্য খাস। তাহলে কি এই হাদীস সুন্নাত হবে? না এটা হাদীস থাকবে।

৪. যেটা বয়ানে জাওয়াযের জন্য।

রাসূলের একটি নবুওয়াতী দায়িত্ব ছিল যেটা জায়েয সেটা একবার হলেও আমল করে দেখান। যেমন : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, তিনি রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছেন, নাতনিকে কাঁধে করে নামায পড়েছেন ইত্যাদি। এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য হলো, 'এগুলোও বৈধ' এ কথা বর্ণনা করা। তাই বলে এগুলোকে সুন্নাত বলা যাবে?

সুতরাং উপরোক্ত ৪টি শর্ত পাওয়া গেলেই কোনো হাদীসকে সুন্নাত বলা যাবে। এ জন্যই নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে কোথাও হাদীস মানতে বলেননি। বরং সকল স্থানে সুন্নাত মানতে বলেছেন। কয়েকটি নমুনা দেখুন :

১. المتمسك بسنتى عندفسادأمتى له أجر شهيد (المعجم الأوسط لأبى القاسم الطبرانى ٣١٥/٥ رقم الحديث ٥٤١٤)

২. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنةنبيه (الموطأبروايتين ٣٣٣٣٨)

৩. من أحياسنةمن سنتى قدأميتت بعدى فإن له من الأجرمثل من عمل بها (سنن الترمذى لمحمدالترمذى ٢٦٧٧)

৪. من أحياسنتى فقدأحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة (سنن الترمذى لمحمدالترمذى ٢٦٧٨)

৫. من أكل طيباوعمل فى سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة (سنن الترمذى لمحمدالترمذى ٢٥٢)

৫. ستةلعنتهم لعنهم الله .....والتارك لسنتى (سنن الترمذى لمحمدالترمذى ٢١٥٤)

৭. تمسك بسنةخيرمن إحداث بدعة. (مسندأحمدبن حنبل ١٦٩٧٠)

৮.مامن نبى بعثه الله فى أمةقبلى إلاكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته(صحيح مسلم ٨٠)

৯.عليكم بسنتى وسنةالخلفاء المهديين الراشدين تمسكوابها وعضواعليها بالنواجذ (سنن أبى داود ٤٦٠٧)

১০. فعليكم بماعرفتم من سنتى وسنةالخلفاء الراشدين المهديين (سنن ابن ماجة للقزوينى ٤٢)

মাত্র কয়েকটি দলিল উল্লেখ করলাম মাত্র। সবগুলোতেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভুলেও তিনি হাদীস শব্দ ব্যবহার করেননি। হাদীস তো রেওয়ায়াত করতে হবে। অতঃপর দেখতে হবে সেটা মানসূখ কি না, গ্রহণযোগ্য কি না, বয়ানে জাওয়াযের জন্য কি না, জাল কি না ইত্যাদি। তারপর সেটি আমলযোগ্য হওয়া না

হওয়ার মাসআলা। এ ছাড়া যেখানে আমলের প্রশ্ন এসেছে, সেখানে রাসূল নিজেই 'সুন্নাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক স্থানে গোমরাহ ফিরকা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়েও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'হাদীস' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, يأتونكم من الأحاديث (সহীহ মুসলিম : ৭) এখানে 'হাদীস' শব্দের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন গোমরাহ ফিরকার জন্য নবীজি 'হাদীস' শব্দ ব্যবহার করলেন। এখন বলেন, আহলে হাদীস নাম রাখা কি জায়েয আছে? তাহলে সহীহ নাম কি হবে? সহীহ নাম হবে, আহলুস সুন্নাহওয়াল জামা'আহ। এখানে 'ওয়াও' অর্থ مع। আর জামা'আতের অর্থ জামা'আতুস সাহাবা। তো সাহাবা কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁদের কথা অনুযায়ী আমরা রাসূলের সুন্নাতকে মানি। এ জন্যই যাঁরা হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন, তাঁরা নিজেদের কিতাবের নামে 'হাদীস' শব্দ ব্যবহার করেননি বরং সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করছেন। যেমন :

سنن الترمذى، سنن أبى داود،سنن ابن ماجه،سنن النسائى

সকলেই 'سنن' শব্দ ব্যবহার করলেন। কারণ তাঁরা জানতেন, আমল করতে হবে একমাত্র সুন্নাতের ওপর, অন্য কিছুর ওপর নয়। এ জন্য আপনারা উসূলে ফিকহের যত কিতাব পড়বেন সবখানেই পাবেন যে শরীয়তের দলিল ৪টি। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাত, ইজমা, কিয়াস। অথচ আহলে হাদীসরা ইজমা-কিয়াস মানেই না। আমি আগেই বলে এসেছি যে ইজমা-কিয়াসকে না মানার দরুন তারা সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم

কে অস্বীকার করেছে। কারণ নবউদ্ভাবিত হাজারো সমস্যা যা সরাসরি কোরআন-হাদীসে নেই; সেগুলোকে ইজমা-কিয়াস দ্বারা ফয়সালা করা হয়েছে। ইজমা মানার দলিল কি কোরআনে নেই? আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

(সূরা নিসা : ১১৫)।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) চারবার কোরআন খতম করেছেন শুধু 'ইজমা'র দলিল বের করার জন্য। আমরা তো সহজেই বলে দিলাম, আর আপনারাও এক মিনিটেই দলিল পেয়ে গেলেন! আর কিয়াসের দলিল হলো فاعتبروا يا أولى الألباب। সুতরাং তাকলীদ করতে হবে, ফকীহকে মানতে হবে, ইজমা-কিয়াস মানতে হবে এ ব্যাপারে কি সন্দেহ করার কোনো অবকাশ আছে?

ইজমা-কিয়াস উভয়টি মানতে হবে একত্রে তার দলিল–

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

(সূরা নিসা : ৫৯) তোমরা আল্লাহকে মানো এটা কোরআন; নবীজিকে মানো এটা সুন্নাত; উলিল আমর এটা ইজমা; এবং ফাইন তানাজা'তুম এটা কিয়াসের দলিল। সুবহানাল্লাহ।

এখন আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে দুটি পয়েন্ট বলব। যার মাধ্যমে আপনারা সহজেই আহলে হাদীসদের এই ফেতনাকে মোকাবিলা করতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ।

১. প্রতিটি মাদরাসায় উলূমুল হাদীস বিভাগ খুলে ছাত্রদেরকে উলূমুল হাদীস পড়িয়ে দিতে হবে এবং যেহেতু এটি একটি ঈমানবিধ্বংসী! ফিতনাতে রূপ নিচ্ছে সুতরাং প্রতিটি মাদরাসায় উলূমুল হাদীস বিভাগ খোলা ফরজে কেফায়া। যখন আমাদের সন্তানদেরকে উলূমুল হাদীস পড়িয়ে দেওয়া হবে, তারা টর্চলাইট হাতে! আহলে হাদীস খুঁজে বের করে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবে। ইনশাআল্লাহ।

২. আপনারা প্রতিটি মসজিদে আমার লেখা 'হাদীসে রাসূল' ও 'তুহফাতুল হাদীস' কিতাব দুটি প্রচার করুন। সেখানে যে মাসআলাগুলো নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে আর বলে, 'তোমাদের কোনো দলিল নেই, তোমাদের ইমাম সাহেব কিয়াস করেছেন' দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো হাদীস সম্পর্কে তাদের অভিযোগ থাকলে সেটার জবাবও দেওয়া হয়েছে। তারা তারীখে ইবনে খালদূনের হাওয়ালায় বলে, তোমাদের ইমাম সাহেব মাত্র ১৭টি হাদীস জানতেন। অথচ এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা। আপনারা কিতাবটি খুললেই দেখতে পাবেন, সেখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, 'আবু হানীফা (রহ.)-এর ১৭টি হাদীসের 'দেওয়ান' ছিল। 'দেওয়ান' অর্থ কিতাব। তাহলে ১৭টি হাদীস আর ১৭টি কিতাব কি এক কথা?

তো তারা যেমন পাবলিককে শিখিয়ে দেয় যে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলতে হবে। আমরাও মুসল্লীদেরকে বুঝিয়ে দেব, 'আমীন' আস্তে বলতে হবে। এই দেখেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এর দলিল।

তো এই দুটি কাজ ১. প্রত্যেক মাদরাসায় 'উলূমুল হাদীস' বিভাগ খোলা। ২. আমার কিতাব ব্যাপক প্রচার করা। তাহলে সাধারণ মানুষও আহলে হাদীসের মোকাবিলা করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ। এবং তাদের ফেতনার ব্যাপারে সজাগ থাকতে পারবে।

এগুলো আপনারা মনে রাখবেন এবং প্রচার করবেন। কারণ এই ফেতনা প্রতিরোধ করা আমাদেরই দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সব কিছুর আগে ঈমান। মানুষের দুনিয়া-আখেরাত–সব কিছু নির্ভর করে ঈমানের ওপর। দুনিয়াবী বিধিবিধানের প্রয়োগ যেমন ঈমানের ওপর নির্ভরশীল, আখেরাতের যাবতীয় সুখ-শান্তিও নির্ভরশীল ঈমানের ওপর।

ঈমানের হাকীকত :

মানুষের যাবতীয় কাজের সঞ্চালক হলো অন্তর। অন্তরের ইচ্ছা ও ভাবনা ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না। ব্যক্তিগত হোক আর সামষ্টিক সর্বক্ষেত্রেই মানুষের কাজের সঞ্চালক এই অন্তরই। তাই যতক্ষণ মানুষের অন্তর ঠিক হবে না, ততক্ষণ তার বাহ্যিক কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তাসহ কোনো কিছুই ঠিক হওয়ার নয়। অন্তরের সঠিক পরিচালনার জন্য ইসলাম এমন এমন সব আকীদা-বিশ্বাস দান করেছে, যে আকীদা-বিশ্বাসের ওপর মানুষ পুরোপুরি স্থিত হলে তার দুনিয়াবী যাবতীয় বিষয় যেমন সঠিক এবং সুন্দর হয়ে যাবে, তেমনি তার পরকালীন জীবনও সুখময় হবে। আর এসব আকীদা-বিশ্বাসের নামই হলো ঈমান।

মানুষের অন্তর সম্পর্কে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

أَلَا وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ۔ (صحيح بخارى، كتاب الايمان)

মানুষের শরীরে একটি গোশতখণ্ড আছে। তা যদি ঠিক থাকে সমস্ত শরীর ঠিক আর তা যদি নষ্ট হয় তবে সমস্ত শরীর নষ্ট। সে টুকরাটা হলো 'অন্তর'। (বুখারী)

অন্তরের অবস্থা :

অন্তরের তিন হালত বা স্তর বর্ণিত হয়েছে।

১। কলবে সালীম। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)। (সূরা শুআরা ৮৯)

কলবে সালীমের স্বভাব হলো সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাভাবিকভাবেই নেকীর পথ গ্রহণকরতঃ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত তরীকা মতে পরিচালিত হওয়া।

২। আছীম। যা সালীমের সম্পূর্ণ বিপরীত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপছন্দ করেন যে নাশোকর, পাপিষ্ঠ। (সূরা বাকারা ২৭৬)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ☆ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

আমি কি তোমাকে বলে দেব শয়তানেরা কার কাছে অবতরণ করে? অবতরণ করে এমন ব্যক্তির কাছে, যে চরম মিথ্যুক, ঘোর পাপিষ্ঠ। (সূরা শুআরা ২২১-২২২)

এই স্তরের অন্তরের লোক হলো তারা যারা সব সময় গোনাহের পথ গ্রহণ করে। আল্লাহর মনোনীত পথের বিপরীত চলতে থাকে।

৩। মুনীব : এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ

তবে কি তারা আসমান ও জমিনের প্রতি লক্ষ করেনি, যা তাদের সামনেও বিদ্যমান আছে এবং পেছনেও? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের ওপর আকাশের কিছু খণ্ড ফেলে দেব। বস্তুত এর মধ্যে নিদর্শন আছে প্রত্যেক এমন বান্দার জন্য, যে আল্লাহর দিকে রুজু করে। (সূরা সাবা ৯)

এই প্রকারের লোক হলো তারা, যারা হঠাৎ সত্য-সরল পথ থেকে পিছলে গেলেও তৎক্ষণাৎ তাওবা করে উত্তম কাজ ও নেকীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

মোট কথা হলো, আল্লাহ রাববুল আলামীন মানুষের যাবতীয় কাজের নিয়ন্ত্রক বানিয়ে দিয়েছেন অন্তরকে। অন্তর যেদিকেই যায় সেদিকেই তার যাবতীয় কর্মচাকা ঘুরতে থাকে। তাই আল্লাহ রাববুল আলামীন যাবতীয় কাজের গ্রহণ ও অগ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও মাপকাঠি বানিয়েছেন এ অন্তরকে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত আমলের ভিত্তি নিয়্যাতের ওপর।

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔(صحيح بخارى)

প্রত্যেক লোকের প্রতিটি আমলের ফলাফল সেটিই হবে, যা সে অন্তরে নিয়্যাত করে। সুতরাং যার হিজরতের উদ্দেশ্য হয় দুনিয়া কামানো বা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার তাহলে সে সেটিই পাবে। এর কোনো ফজীলত সে পাবে না। (বুখারী)

বোঝা গেল, অন্তর যতক্ষণ ঠিক হচ্ছে না, ততক্ষণ মানুষের কোনো কাজই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তর ঠিক হওয়ার যে আকীদা-বিশ্বাস বা নীতিমালাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে

সেগুলোর নামই ঈমান। সে কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের কল্যাণে যত নবী-রাসূল (আ.) পাঠানো হয়েছে তাঁরা সকলে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন, এরপর আমলে সালেহের কথা বলেছেন।

ঈমান ব্যতিরেকে কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ (العصر)

বস্তুত মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়। (সূরা আসর ২-৩)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا۔ (النساء ٤٨)

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যেকোনো বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে সে এমন এক অপবাদ আরোপ করে, যা গুরুতর পাপ। (সূরা নিসা ৪৮)

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ (المائدة ٧٢)

নিশ্চয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ (ابراهيم١٨)

যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে তাদের অবস্থা এই যে তাদের কর্ম সেই ছাইয়ের মতো, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা কিছু উপার্জন করে তার কিছুই তাদের হস্তগত হবে না। (সূরা ইবরাহীম ১৮)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ (النور٣٩)

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের কার্যাবলি যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি, অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে, তখন বুঝতে পারে তা কিছুই নয়। (সূরা নূর ৩৯)

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ۔ (النور٤٠)

অথবা তাদের (কার্যাবলির) দৃষ্টান্ত এ রকম, যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার ওপর আরেক তরঙ্গ এবং তার ওপর মেঘরাশি। এভাবে স্তরের ওপর স্তরে বিন্যস্ত আঁধারপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে তাও দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার নসীবে কোনো আলো নেই। (সূরা নূর ৪০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ (البقرة ٢٦٤)

হে মুমিনগণ! খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সাদাকাকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এই রকম–যেমন এক মসৃণ পাথরের ওপর মাটি জমে আছে। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং (সে মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় এবং) সেটিকে (পুনরায়) মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়। এরূপ লোক যা উপার্জন করে, তার কিছুমাত্র তাদের হস্তগত হয় না। আর আল্লাহ (এরূপ) কাফেরদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না। (সূরা বাকারা ২৬৪)

ঈমান এবং মুমিনের ফজীলত :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا ـ أَوِ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ ـ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ." قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو " الْحَيَاةِ ." وَقَالَ " خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ ."

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পরে আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদের) বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আসো। তারপর তাদের দোযখ থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের হায়াতের নদীতে ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে ওঠে। তুমি কি দেখতে পাওনা সেগুলো কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?
(বুখারী হা. ২২)

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ :يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ :لَبَّيْكَ يَا

পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা ফাতাহ ২৯)

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে। (হজ ৩৮)

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

আল্লাহ মুমিনের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য বিজয় অর্জনের কোনোও পথ রাখবেন না। (সূরা নিসা ১৪১)

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

আর মুমিনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আমি নিজের ওপর রেখেছি। (সূরা রূম ৪৭)

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (الأعراف٩٦ :)

যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উভয় দিক থেকে বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। (সূরা আরাফ ৯৬)

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا) (الكهف١٠٧ :)

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য অবশ্যই ফিরদাউসের উদ্যান রয়েছে। (সূরা কাহাফ ১০৭)

ঈমানের অতীব গুরুত্ব ও ফজীলত সম্পর্কে অগণিত কোরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে এখানে কয়েকটা উল্লেখ করা হলো। এসব আয়াত ও হাদীস থেকেই অনুমান করা যায় ঈমানের গুরুত্ব কতটুকু এবং দুনিয়া-আখেরাতে এর ফজীলত ও মর্যাদা কী পরিমাণ।

পবিত্র কোরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে এ কথাও বোঝা যায়, ঈমানের নিয়ামত মুসলমানদের মাঝে যত বেশি আলোকিত থাকবে দুনিয়াবী সুখ-শান্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলিম উম্মাহের

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কেয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত লাভে কে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কেয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালিস দিলে লা ইলাহা ইল্লাহ বলে। (বুখারী)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ) الآية (النور٥٥ :)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজের খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন। (সূরা নূর ৫৫)

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা

رَسُولَ اللَّـهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ :يَا مُعَاذُ، قَالَ :لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّـهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّـهِ :أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ :إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا (بخارى ١٢٨)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার মু'আয (রা.), রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ডাকলেন, হে মু'আয ইবনু জাবাল! মু'আয (রা.) উত্তর দিলেন, 'আমি হাজির ইয়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং (আপনার আদেশ পালনের জন্য) প্রস্তুত। তিনি ডাকলেন, মু'আয! ম'আয (রা.) উত্তর দিলেন, 'আমি হাজির ইয়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং প্রস্তুত।' তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হাজির ইয়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং প্রস্তুত। এরূপ তিনবার করলেন। এরপর বললেন, যেকোনো বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল' তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে।' মু'আয (রা.) (জীবনভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইলম গোপন রাখার) গোনাহ না হয়। (বুখারী ১২৮)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ :قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ

সাথী হবে। আখেরাতের সুখ-শান্তি তো আছেই। ঈমানে যত বেশি ঘাটতি দেখা দেবে মুসলমানদের অবস্থা হবে বিপদসঙ্কুল। দুনিয়াতেও আখেরাতেও।

এ কারণে আমাদের ঈমান-আকীদা কতটুকু সঠিক এবং এর মধ্যে কতটুকু ঘাটতি আছে তা বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক।

মুসলমানের ঈমান-আমলের মহা সম্পদ সম্পর্কে বিধর্মীদের বড় বড় গবেষকগণ কমবেশি অবগত। তারা সব সময় চায় মুসলিম উম্মাহ থেকে এই নিয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারলে বা তার মধ্যে বিভিন্ন বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারলে তারা রূহানী শক্তি হারাবে। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুখ-শান্তি নিমেষেই শেষ হয়ে যাবে।

এতদ উদ্দেশ্যে ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে তাদের মিশন জারি ছিল এবং এখনও আছে।

ইসলামের প্রারম্ভ যুগ থেকে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন বাতিল ফিরকা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এটিই। যে কোনো বাতিল ফিরকা সৃষ্টি হলে দেখা যেত, তারা কিছু আমল এবং কিছু আকীদা-বিশ্বাসে বিকৃত ঘটানোর নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই বাতিল ফিরকার এরূপ আচরণ লক্ষ করা গেছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ইমাম মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস এবং উলামায়ে কেরাম প্রতিটি যুগে এরূপ বাতিল ফিরকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং মুসলমানদের সচেতন করেছেন। যুগে যুগে তাদের মেহনতের ফলে ইসলামের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস ও আমলগুলো যেমন সঠিকভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছার একটা শক্তিশালী ধারাবাহিকতা ছিল এবং আছে, তেমনি বাতিল ফিরকারও বিভিন্ন ধারাবাহিকতা রয়েছে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন মোড়কে। যুগে যুগে তাদের নাম এবং মোড়ক পাল্টাতে হয়েছে। কারণ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন যাদেরকে বাতিল বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন তাদের সে পুরনো নাম আর লেভেল থাকলে তাদেরকে পরিচিত ও চিহ্নিত বাতিল ফিরকা হিসেবেই থাকতে হবে। মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারবে না। সে কারণে যুগে যুগে তাদের নাম পাল্টিয়েছে লেভেল বদলেছে।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ও উত্তম যুগের অনুসরণের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর ইত্তিবাকারীগণ মজবুত ধারাবাহিকতা নিয়ে আল্লাহর অপার কৃপায় সঠিক ঈমান-আমল নিয়ে বর্তমানেও দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা রাখবেন এবং উত্তম রূপে রাখবেন।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِذَا شَذَّ الشَّاذُّ مِنْهُمُ اخْتَطَفَهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذِّئْبُ الشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ (المعجم الكبير)

'আমার উম্মতের সামষ্টিকতার ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে, যে উক্ত ঐক্যবদ্ধ দল থেকে বের হয়ে যাবে শয়তান তাকে এমনভাবে কেড়ে নেবে যেমন পালচ্যুত ছাগলকে বাঘ কেড়ে নেয়।

(মুজামে কাবীর ১/১৬৮ হা. ৪৮৯)

আরেক হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ -أَوْ قَالَ أُمَّتِي -عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا، وَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ (مستدرك حاكم)

'আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একত্রিত হবে না। আমার উম্মতের সামষ্টিকতার ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে, যে উক্ত ঐক্যবদ্ধ দল থেকে বের হয়ে যাবে শয়তান তাকে কেড়ে নেবে। তোমরা যদি তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য পাও, তবে সাওয়াদে আজম তথা বড় দলের অনুসরণ করো। কারণ যে এই দল থেকে পৃথক হবে সে জাহান্নামী।' (মুসতাদরাকে হাকেম ১/২০২ হা. ৩৯৫)

বক্ষমান লেখায় আমরা মুসলমানদের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস নিয়েই আলোচনা করব। প্রথমে ইলমুল আকায়েদের কিছু পরিভাষা ও কিছু মূলনীতির ব্যাখ্যা করা হবে। এরপর কোরআন-হাদীস থেকে সহজ-সরল আকায়েদগুলো ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হবে। অতঃপর বিভিন্ন বাতিল ফিরকা কর্তৃক আকীদার বিভিন্ন বিষয়ে হামলা চালিয়ে বিকৃতির যে চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোর উত্তমরূপে পর্যালোচনার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস

দ্বীনের যেসব বিষয় অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক সেগুলোকে 'ঈমানিয়াত' 'আকায়েদ' তথা আকীদা-বিশ্বাস বলা হয়। বিভিন্ন কিতাবে এ অধ্যায়কে 'উসূলে দ্বীন' 'জরুরিয়াতে দ্বীন'ও বলা হয়েছে। তবে এর মধ্যে যেসব বিষয় না মানার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় সেগুলোকে 'জরুরিয়াতে দ্বীন' তথা 'দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়' বলা হয়। পরিভাষায় যেটাই বলা হোক না কেন, এক কথায় অন্তরের বিশ্বাসসংক্রান্ত সব বিষয়কে 'আকায়েদ' বলা হয়ে থাকে।

ঈমানের সংজ্ঞা :

সহীহে বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে ঈমানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে।

وَالْإِيمَان لُغَة التَّصْدِيق ، وَشَرْعًا تَصْدِيق الرَّسُول فِيمَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبّه .(فتح

البارى)

অর্থাৎ ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো, 'সত্যায়ন করা', 'নিরাপত্তা দেওয়া'।

শরয়ী পরিভাষায় 'রাসূল (সা.) যেসব বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে আনয়ন করেছেন এর সব কিছুকে অন্তরে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয় (ফতহুল বারী ১/৮)।

আকীদাতুত তাহাবিয়্যাতে বলা হয়েছে–

والإيمان : هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان.(العقيدة الطحاوية)

অর্থাৎ : ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস আর মুখের স্বীকৃতি।

অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলা হলেও অনেক সময় অন্তরের বিশ্বাস থাকার পরও মুখে এবং কাজকর্মে কুফর বিদ্যমান থাকে। যেমন মদীনার ইহুদীদের বিশ্বাস এবং আবু জাহেলের বিশ্বাস। তাদের অন্তরে বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী। কিন্তু তারা মুখে স্বীকার করত না বরং কুফরী কাজে লিপ্ত থাকত। এদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ রূপে কুফরী। এই বিশ্বাসের নাম ঈমানে গাইরে এখতেয়ারী।

শরহে বুখারী ফয়জুলবারীতে যেমন আছে–

التَّصديق قد يجتمع مع الجُحود أيضاً وهو كفرٌ قطعاً

অনেক সময় অন্তরের বিশ্বাস এবং বিরোধিতা একত্রিত থাকে। তাও কুফর।

যেমন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً (النمل)

অর্থ : তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকাবশত সব অস্বীকার করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিল। (সূরা নামাল ১৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمْ (البقرة)

অর্থ : তারা তাকে এতটা ভালোভাবে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে। (সূরা বাকারা ১৪৬)

আরেক আয়াতে আছে–

فَلَمَّا جاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (البقرة)

কিন্তু যখন সে জিনিস আসল, যাকে চিনতে পেরেছিল, তখন তাকে অস্বীকার করে বসল। (সূরা বাকারা ৮৯)

সুতরাং ঈমান আনার জন্য বিশ্বাসের সাথে মৌখিকভাবে স্বীকার করা অত্যাবশ্যক। যাকে ঈমানের শর্ত বলা হয়েছে। তবে মুখের স্বীকৃতি শুধু স্বীকৃতির সীমায় থাকলেই হবে। সেটা এলান বা প্রচার করা শর্ত নয়। তবে দ্বীনি বিধানাবলি প্রয়োগের জন্য যে সাক্ষী প্রয়োজন তা আমীরুল মুমিনীন বা তার প্রতিনিধির সামনে মুখে স্বীকার বা ঘোষণা করা কিংবা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এলান আবশ্যক। অথবা যে লোক ঈমান এনেছে প্রয়োজনের সময় তা মুখে স্বীকার করতে হবে। স্বীকার না করলে সে কাফের 'জাহেদ'ই থেকে যাবে। অর্থাৎ জাহেরী হুকুম প্রয়োগ করার জন্য 'ইকরার বিল্লিসান' তথা মৌখিক স্বীকৃতি আবশ্যক। (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন ৪/২২২, ৪/৪০৬)

أن الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفى مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره كذا فى شرح المقاصد .(حاشية ابن عابدين: ج ص) يلزم المصدق أنه يعتقد أنه متى طولب به أتى به، فإن طولب به فلم يقر به فهو -أى كفه عن الاقرار -كفر عناد.(حاشية ابن عابدين)

রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত সকল আহকাম-বিধানাবলির ওপর বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক :

রাসূল (সা.) কর্তৃক আল্লাহর কাছ থেকে আনীত সকল বিষয়াদির ওপর ঈমান রাখা আবশ্যক এর মধ্যে আকীদা এবং আহকাম সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত। এসব বিধানাবলি ওহীর যেকোনো প্রকার তথা ওয়াহীয়ে মতলু-কোরআন মজীদের রূপে পৌঁছুক বা গাইরে মাতলূ হাদীস শরীফের রূপে পৌঁছুক। সব কিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

(আকীদাতুত্তাহাবী)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (سورة الأحزاب)

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো এখতিয়ার বাকি থাকে না। (সূরা আহযাব ৩৬)

মুমিন :

ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিকে মুমিন বলা হয়।

ইসলামের সংজ্ঞা ও নেক আমলের গুরুত্ব :

ইসলাম :

ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, ঝুঁকে যাওয়া, অবনত মস্তক হওয়া। পরিভাষায় ইসলাম বলা হয়, 'মানুষের জীবনযাপনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণের মাধ্যমে যে পদ্ধতি ও পন্থা পাঠিয়েছেন তা অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া। জীবনের প্রতিটি স্তরে তা বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ-

আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। (আলে এমরান ১৯)

ইসলাম এবং ঈমান দুটি শব্দ অনেক সময় এক অর্থেও প্রয়োগ হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্যও করা হয়।

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ـ

ইসলাম হলো, এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানের রোযা রাখা, সামর্থ্য থাকলে হজ করা। (বুখারী হা. ১)

الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ.

ঈমান সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

ঈমান হলো, আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা, আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, রাসূলগণ এবং পুনরুত্থান দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (বুখারী হা. ৫০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

দেহাতীরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলো, তোমরা ঈমান আনোনি। তবে এই বলো যে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মের (সাওয়াবের) ভেতর কিছুমাত্র কম করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা হুজরাত ১৪)

এরূপ আরো বহু আয়াত ও হাদীস থেকে বোঝা যায় ইসলাম এবং ঈমান শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে এক অর্থে ব্যবহার হয় আবার অনেক সময় কিছুটা পৃথক অর্থেও ব্যবহার হয়।

ইসলামের সবচেয়ে বড় রুকন দুটি :

ইসলামের সবচেয়ে বড় ফরয হলো দুটি বিষয় তথা উলূহিয়্যাত এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া।

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

কোনো লোক এ কালেমা মুখে স্বীকার করার পর বাহ্যিকভাবে তার ওপর ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলি প্রয়োগ হবে। যেমন তার জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া, তার ওপর জানাযার নামায পড়া, মুসলমানদের সাথে তার বিয়েশাদি, মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা ইত্যাদি। (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন ৪/২২২)

والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية أى من الصلاة عليه وخلفه والدفن فى مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكوات.

মুসলমান হওয়ার পর করণীয় :

কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের বিধানাবলি পালন করা তার ওপর ফরয হয়ে যায়। বিধানাবলির ওপর আমল করার নাম হলো ইসলাম। যেমন–নামায আদায় করা, নেসাবের মালিক হলে যাকাত দেওয়া, সামর্থ্য থাকলে হজ করা, রোযা রাখা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, নিজের বংশবিস্তারের জন্য বৈধ পন্থায় বিয়ে করা, হালাল উপার্জনের পথ গ্রহণ করাসহ দ্বীনের যাবতীয় বিষয় তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً-

তোমরা যারা ঈমান এনেছ ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দীক্ষিত হয়ে যাও। (বাকারা ২০৮)

নেক আমলের আবশ্যকতা :

ঈমানের পর নেক আমল দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয়। সব সময় এই বিশ্বাস ধারণ করতে হবে, ইসলামের বাতলানো নেক আমল সব সময় কল্যাণকর এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি সব সময় ক্ষতিকর। এর বিপরীতে নেক আমলকে ক্ষতিকর এবং নিষিদ্ধ বস্তুকে কল্যাণকর হওয়ার বিশ্বাস রাখা কুফরী।

ولا نقول :لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله .(العقيدة الطحاوية) قَالَتِ الْمُرْجِئَة :لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَه !وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا .(العقيدة الطحاوية مع شرحه لابن ابى العز ٢١٥/١) مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين، فقالوا :إن الأعمال أيضاً لا بد منها، لكنّ تَارِكها مُفَسَّقٌ لا مُكَفَّر.(فيض البارى ٧١/١)

মুসলিম বা মুসলমান নামকরণ :

দ্বীনে ইসলামকে মান্যকারী ব্যক্তিকে মুসলিম অথবা মুসলমান বলা হয়। এই নামকরণের উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম মানেই অবনত মস্তক হওয়া। আর মুসলমান অবনত মস্তকে দ্বীনে ইসলাম মান্য করে থাকে। তাই তাদের মুসলমান বলা হয়। এই নাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

তিনি পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও (অর্থাৎ কোরআনেও)। (সূরা হজ ৭৮)

হাদীস শরীফে এসেছে–

فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের নামসমূহ মুসলিমীন, মুমিনীন ও ইবাদুল্লাহ দ্বারা ডাকো। যে নামগুলো আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন। (আহমাদ

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (بخارى بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ)

قَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (بخارى بَاب الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَاالخ)

وَمِنْ جِنْسِ ذَلِكَ مَا يَدَّعِيهِ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي التَّصَوُّفَ أَنَّهُ بَلَغَ حَالَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَسْقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةَ وَحَلَّ لَهُ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَالْمَعَاصِي وَأَكْلُ مَالِ السُّلْطَانِ، فَهَذَا مِمَّا لَا أَشُكُّ فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ إذْ ضَرَرُهُ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ؛ وَيَنْفَتِحُ بِهِ بَابٌ مِنْ الْإِبَاحَةِ لَا يَنْسَدُّ؛

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

হা. ১৭২০৯)

فَادْعُوا بِدَعْوَى اللّٰهِ الَّذِى سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللّٰهِ۔

'তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত নামে ডাকো। যিনি তোমাদেরকে মুসলিমীন, মুমিনীন এবং ইবাদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) নামে অভিহিত করেছেন।' (তিরমিযী হা.২৮৬৩; সহীহ ইবনু হিবান হা. ৬২৩৩)

মুকাল্লাফ :

মুকাল্লাফ বলা হয় শরীয়তের আহকাম পালনে দায়িত্বঅর্পিতদেরকে। অর্থাৎ যাদের জন্য শরীয়তের আহকাম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা আবশ্যক।

প্রত্যেক মুসলমান বালেগ আকেল (বিবেকসম্পন্ন) ব্যক্তিই শরীয়তের 'মুকাল্লাফ' তথা শরীয়ত পালনে বাধ্য। শিশু (নাবালেগ) এবং পাগল (বিবেক বুদ্ধিহীন, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী) শরীয়তের 'মুকাল্লাফ' নয়। অর্থাৎ তারা এর জন্য দায়িত্বঅর্পিত নয়। অমুসলিমগণ ঈমানের মুকাল্লাফ। অর্থাৎ প্রথমে তাদের ঈমান আনতে হবে তারপর যাবতীয় বিধানাবলির মুকাল্লাফ হবে। এই বিধানের ভিত্তিতে কোনো মুসলমান বালেগ এবং আকেল ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম নয়। কেউ যদি বলে আমি ইবাদত এবং রিয়াজাত মুজাহাদা করে এমন স্তরে পৌঁছে গেছি, এখন আমি আর শরীয়তের মুকাল্লাফ নই। এরূপ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া হলো এরূপ ব্যক্তি মুরতাদ। (বুখারী ১৩৯৫, রাদ্দুল মুহতার ৪/২৪৩)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৬

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

আর্থিক ডকুমেন্টের ইন্ডোর্সমেন্ট (Endorsment) বিষয়ে শরীয়া বিধান :

প্রথমত ইন্ডোর্সমেন্টের দুটি প্রকার–(১) মালিক বানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইন্ডোর্স করা। (২) প্রতিনিধি হিসেবে ইন্ডোর্স করা। প্রথম প্রকারের ইন্ডোর্সমেন্টে ইন্ডোর্সকারী (Endoser) ডকুমেন্টের মূল্য যার জন্য ইন্ডোর্স করা হয় (Beneficiary) তাকে হস্তান্তর করে। এমতাবস্থায় ইন্ডোর্সকারী (Endoser) যদি যার জন্য ইন্ডোর্স করাবে (Beneficiary) এর নিকট ঋণগ্রহীতা হয় তাহলে উক্ত ইন্ডোর্স প্রক্রিয়াটি হাওয়ালা হবে। যদি ওই রকম না হয় তাহলে সেটা হবে কবজ করার জন্য উকিল বানানো। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে গ্রাহক ইন্ডোর্সমেন্টের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ডকুমেন্টের মূল্য উসূল করতে চায়। এই প্রক্রিয়াটি হাওয়ালা নয় বরং ওয়াকালাহ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। চাই এটি মজুরির ভিত্তিতে হোক বা মজুরিবিহীন।

ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ (Remittance/Transper of maoney) বিষয়ে শরীয়া নীতিমালা :

যদি গ্রাহক (Clint) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট এই মর্মে আবেদন করে যে, আমার চলতি হিসাব থেকে নির্ধারিত মুদ্রায় অমুক ব্যক্তিকে টাকা পাঠিয়ে দিন তাহলে উক্ত প্রক্রিয়া হবে হাওয়ালা। এর ওপর ব্যাংক যেই ফি গ্রহণ করবে, তা বৈধ। কেননা উক্ত ফি হবে টাকা পৌঁছানোর ফি।

(المعيار الشرعية)

অঙ্গীকারনামা (Promissory Note) :

অঙ্গীকারনামার সংজ্ঞা :

An unconditional promise in writing made by one person to another signed by the maker engaging to pay on demand at a fixed or determinable future time, a sum certain in money to or to the order of a specified person, or to bearer.

অর্থাৎ, অঙ্গীকারনামা এক ব্যক্তি নিজের দস্তখতসম্বলিত অপর ব্যক্তির নামে শর্তবিহীন লিখিত অঙ্গীকারকে বলে। যাতে অঙ্গীকারনামা প্রস্তুতকারী এই অঙ্গীকার করে যে সে এতে উল্লিখিত টাকা যখন চাওয়া হবে বা ভবিষ্যৎ নির্ধারিত সময় আসলে তাকে অথবা তার নির্দেশ মতে অন্য কোনো ব্যক্তিকে অথবা বাহককে অথবা উক্ত অঙ্গীকারনামা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে আদায় করবে। (تعارف زر وبينكارى ২০৮)

অঙ্গীকারনামার অনিবার্য শর্তসমূহ :

(১) শর্তবিহীন হওয়া। (২) লিখিত হওয়া। (৩) নির্দিষ্ট অংকের পরিমাণ পরিশোধ করার ওপর হওয়া। (৪) টাকার পরিশোধ কোনো উল্লিখিত ব্যক্তিকে অথবা তার নির্দেশে অন্য কোনো ব্যক্তিকে বা অঙ্গীকারনামার বাহক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে করা। (৫) টাকার পরিশোধ প্রাপকের চাওয়া অথবা ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারণ যোগ্য তারিখের ওপর হওয়া। (৬) অঙ্গীকারকারীর দস্তখত থাকা।

অঙ্গীকারনামার অপর সংজ্ঞা :

Promissory Note : a financial instrument containing an unconditional undertaking singed by the maker to pay on demand, or at a fixed or determinable time in future, a certain sum of money to the holder or to the bearer of the instrument, or to the order of a designated party. (Glossary, Banking and finance)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার সারসংক্ষেপ ও পূর্বোক্ত সংজ্ঞার মতোই।

শরীয়া বিধান :

উক্ত নোটের ওপর কবজ করা এতে উল্লিখিত টাকার ওপর কবজ করা নয় বরং ওই ধরনের নোট দ্বারা ওই সব আর্থিক মুআমালাতে লেনদেন করা বৈধ নয়, যাতে কবজ করা শর্ত। যথা বাই ছরফ অথবা বাই সলম অর্থাৎ বাই ছরফের মধ্যে উক্ত নোটকে ছরফের বিনিময় এবং বাই ছলমের মধ্যে উক্ত নোটকে রা'সুলমাল অর্থাৎ ছমন বানানো বৈধ হবে না। তদ্রূপ অঙ্গীকারনামাকে তার ফেসভ্যালু (Face Value)-এর অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করাও অবৈধ। (المعايير الشرعية)

হস্তান্তরযোগ্য বিল (Bill of exchange) চেক (Cheque) এবং অঙ্গীকারনামা (Promessory Note) এর মধ্যে পারস্পরিক উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ

চেক এবং বিলের মধ্যে পার্থক্য :

(১) হস্তান্তরযোগ্য বিল যে কারো নামে ইস্যু করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে চেক কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নামেই ইস্যু করা যায়। (২) হস্তান্তরযোগ্য বিল যার নামেই ইস্যু করা হবে এর পক্ষ থেকে উক্ত বিল গ্রহণ করা জরুরি। পক্ষান্তরে ব্যাংকের পক্ষ থেকে চেক কবুল করা জরুরি নয়। (৩) হস্তান্তরযোগ্য বিলের পরিশোধ প্রাপকের চাওয়া অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারণযোগ্য কোনো তারিখের ওপর হয়ে থাকে পক্ষান্তরে চেকের পরিশোধ চেকে উল্লেখিত তারিখ মতে চাহিদা পেশ করার ওপর হয়ে

থাকে। (৪) হস্তান্তরযোগ্য বিল ক্রস করা যায় না অথচ চেক ক্রস করা যায়। (৫) হস্তান্তরযোগ্য বিলে ডিসকাউন্ট হতে পারে। পক্ষান্তরে চেকের মধ্যে কোনো প্রকারের ডিসকাউন্ট করা যায় না। (৬) হস্তান্তরযোগ্য বিলে উল্লিখিত টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা যায় পক্ষান্তরে চেকের মধ্যে উল্লিখিত টাকা কিস্তিতে আদায় করা যায় না। ইত্যাদি।

বিল এবং অঙ্গীকারনামার মধ্যে পার্থক্য

(১) বিল যখন গ্রহণ করা হয় তখন উক্ত বিল যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার দায়দায়িত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ের রয়ে যায় পক্ষান্তরে প্রমিসরি নোট প্রস্তুতকারী প্রথম ঋণগ্রহীতা হয় এবং সে উক্ত অঙ্গীকারনামা গ্রহণকারীর সাথে যোগাযোগ করে। (২) বিল কোনো নির্দিষ্ট টাকা পরিশোধের শর্তবিহীন একটা নির্দেশনামা পক্ষান্তরে প্রমিসরি নোট কোনো নির্দিষ্ট টাকা পরিশোধের শর্তবিহীন অঙ্গীকার মাত্র। (৩) বিলের জন্য গ্রহণ করা জরুরি পক্ষান্তরে প্রমিসরি নোটের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা জরুরি নয়। কেননা অঙ্গীকারনামা টাকা পরিশোধকারীকে চিঠি লিখে দেয়। (৪) বৈদেশিক বিল দুই-তিন সেটে তৈরি হয় পক্ষান্তরে অঙ্গীকারনামা কোনো সেট আকারে তৈরি হয় না। (৫) বিল প্রস্তুতকারকদের দায়িত্ব যৌথ থাকে। পক্ষান্তরে অঙ্গীকারনামা প্রস্তুতকারীগণ যৌথভাবে উক্ত অঙ্গীকারনামার ভাষ্য মতে যৌথ অথবা ব্যক্তিগতভাবে উক্ত টাকা পরিশোধের জিম্মাদার হয়। (৬) বিল দ্বারা ব্যাপক হারে সাধারণ লেনদেন হয়। পক্ষান্তরে অঙ্গীকারনামা দ্বারা সীমিত আকারে লেনদেন হয়ে থাকে। (৭) বিল বৈদেশিকও হতে পারে। পক্ষান্তরে অঙ্গীকারনামা কেবলমাত্র আন্তদেশীয়ই হতে পারে।

প্রমিসরি নোট এবং চেকের মধ্যে পার্থক্য :

(১) প্রমিসরি নোট কোনো নির্দিষ্ট অংকের টাকা পরিশোধের জন্য শর্তবিহীন অঙ্গীকার। পক্ষান্তরে চেক ব্যাংকের নামে নির্দেশনামা। (২) প্রমিসরি নোটের কেবল দুটি পক্ষ থাকে। অঙ্গীকারকারী এবং টাকার প্রাপক। পক্ষান্তরে চেকের মধ্যে তিনটি পক্ষও হতে পারে। (৩) প্রমিসরি নোটের মধ্যে টাকা পরিশোধের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখ থাকে। পক্ষান্তরে চেক সর্বদা চাহিদামাফিক আদায় করা ওয়াজিব হয়। (৪) প্রমিসরি নোটের ব্যবহার সীমিত। পক্ষান্তরে চেকের ব্যবহার ব্যাপক। (৫) প্রমিসরি নোটের পরিশোধ নোট তৈরিকারীকেই করতে হয়। তা সত্ত্বেও নোট প্রস্তুতকারী যদি যৌথ কারবারের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে নোটের পরিশোধ তাদের যৌথ দায়িত্ব হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে চেকের পরিশোধ কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ব্যাংক এবং এর নির্ধারিত শাখা থেকেও হতে পারে।

ক্রেডিট কার্ড (Credit Card) :

বর্তমান যুগে তিন প্রকারের কার্ডের প্রচলন রয়েছে।

(১) ক্রেডিট কার্ড- Credit Card।
(২) ডেবিট কার্ড- Debit Card।
(৩) চার্জ কার্ড- Charge Card।

ক্রেডিট কার্ড- (Credit Card) :

ব্যাংকে উক্ত কার্ডদ্বারীর কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে না বরং সে উক্ত ব্যাংকের সাথে বাকিতে লেনদেনের ওপর চুক্তিবদ্ধ হয়। উক্ত চুক্তি অনুসারে ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকিতে লেনদেনের সুযোগ সরবরাহ করে থাকে। উক্ত সময়ের ভেতরে কার্ডদ্বারী ব্যক্তি ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করলে কার্ডদ্বারীকে সুদ দিতে হয় না। কিন্তু চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় মূলত সুদের ভিত্তিতে। সুদের আদায়ের অঙ্গীকারও করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া এতে সময় নবায়নের (Rescheduling) সুযোগও থাকে বিদ্যমান। ফলে পাওনা পরিশোধের সময় বৃদ্ধি পায়। তবে এর সাথে সাথে সুদের হারও বাড়তে থাকে এবং কোনো কোনো অবস্থায় অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়।

(২) ডেবিট কার্ড- (Debit Card) :

পূর্ব থেকেই উক্ত কার্ডদ্বারীর অ্যাকাউন্ট ওই ব্যাংকে থাকে, যেই ব্যাংকের কার্ড সে সংগ্রহ করেছে। কার্ড হোল্ডার যখনই উক্ত কার্ড ব্যবহার করে তখন ব্যাংক তার অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত টাকা থেকে তা পরিশোধ করে দেয়। এতে কার্ড হোল্ডার ঋণের সুবিধা পায় না। বরং সে ওই সময় পর্যন্ত কার্ড ব্যবহার করতে পারে, যতক্ষণ তার অ্যাকাউন্টে টাকা থাকে। ব্যাংক উক্ত কার্ড ইস্যুর ফি গ্রহণ করে।

(৩) চার্জ কার্ড- (Charge Card) :

এই কার্ডদ্বারীর পূর্ব থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে না। বরং ব্যাংক কার্ড হোল্ডারকে ঋণের সুবিধা প্রদান করে। কার্ড হোল্ডারকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণের সুবিধা প্রদান করা হয়। যেই সময়ের ভেতরে কার্ড হোল্ডারের জন্য ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ অনিবার্য হয়। উক্ত নির্ধারিত সময়ে যদি সে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে তাহলে সুদ দিতে হয় না। অন্যথায় তাকে সুদসহ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে হয়। ব্যাংক এই ধরনের কার্ড ইস্যু করার ফি গ্রহণ করে।

শরীয়া বিধান :

ডেবিট কার্ডের শরীয়া বিধান :

এই ধরনের কার্ড ব্যবহার নিঃসন্দেহে বৈধ, এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেননা এতে ঋণ পদ্ধতি নেই। তবে কার্ড হোল্ডারের জন্য এটা জরুরি যে সে যেন উক্ত কার্ড শরীয়া পরিপন্থী কোনো কাজে ব্যবহার না করে।

চার্জ কার্ডের শরীয়া বিধান :

এই ধরনের কার্ড নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করা বৈধ। (১) কার্ড হোল্ডার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে রাখবে যাতে ব্যাংকের প্রদেয় ঋণের ওপর সুদ আসার সম্ভাবনা মোটেও না থাকে। (২) কার্ড হোল্ডার শরীয়া পরিপন্থী কোনো

কাজে উক্ত কার্ড যাতে ব্যবহার না করে। (৩) যদি ডেবিট কার্ড দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয় তাহলে অন্য কার্ড ব্যবহার না করা উত্তম।

ক্রেডিট কার্ডের শরীয়া বিধান :

এই ধরনের কার্ড ব্যবহার করা অবৈধ। তবে যদি ডেবিট কার্ড বা চার্জ কার্ড পৃথকভাবে পাওয়া না যায় তাহলে ক্রেডিট কার্ডকে ডেবিট কার্ড বা চার্জ কার্ডের মতো পূর্বোক্ত শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। উল্লিখিত সব কার্ডকেই ক্রেডিট কার্ড বলা হয়। কিন্তু মূলত ক্রেডিট কার্ড হলো ওই কার্ড, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যার ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। তবে ক্রেডিট কার্ড দ্বারা যদি ডেবিট বা চার্জ কার্ড বোঝানো হয় তা হলে ওই ধরনের কার্ড ব্যবহার করা বৈধ।

এটিএম কার্ড- ATM (Automated Transfer Machine Card)

এটি টাকা উত্তোলনের কার্ড, যা বর্তমানে ব্যাপকতা লাভ করেছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা যায়।

এটিএম কার্ডের শরীয়া বিধান :

এই ধরনের কার্ড ব্যবহারের ওপর যদি নির্দিষ্ট টাকা মেশিন ব্যবহারের ফি হিসেবে ব্যাংক গ্রহণ করে উত্তোলনকৃত টাকার পরিমাণ বিবেচনায় না নিয়ে তাহলে বৈধ। তবে ব্যাংক যদি উত্তোলনকৃত টাকার বিবেচনায় ফি নির্ধারণ করে তাহলে এটা বৈধ হবে না বরং সুদ হবে। তবে ব্যাংক কার্ড ইস্যুর ফি গ্রহণ করতে পারে।

فى المعايير الشرعية : بطاقة الحسم الفورى (Debit Card) تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد فى حسابه تخول هذه البطاقة لحاملها السحب او تسديد اثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فورا، ولا تخول الحصول على ائتمان، لا يتحمل العميل رسوما مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبا الا فى حال سحب العميل نقدا وشراء ه عملة اخرى عن طريق مؤسسة اخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة، تصدر هذه البطاقة برسم او بدونه، تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من اثمان المشتريات او الخدمات، بطاقة الائتمان والحسم الآجل (Charge Card) هذه البطاقة اداة ائتمان فى حدود سقف معين لفترة محددة وهى ادلة وفاء ايضا تستعمل هذه البطاقة فى تسديد اثمان السلع والخدمات وفى الحصول على النقد، لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة اليه من المؤسسة، اذا تأخر حامل البطاقة فى تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية اما المؤسسات فلا تترتب فوائد ربوية، لا تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة اية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات ولكنها تحصل على نسبة معينة (عمولة) من قابل البطاقة على مبيعاته او خدماته التى تمت بالبطاقة۔

تلتزم المؤسسة فى حدود سقف الائتمان (وبالزيادة الموافق عليها) للجهة القابلة للبطاقة بسداد اثمان السلع والخدمات وهذا الالتزام بتسديد اثمان المبيعات والخدمات شخصى ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقةبحامل البطاقة، للمؤسسة المصدرة للبطاقة حق شخصى ومباشر قبل حامل البطاقة فى استرداد ما دفعته عنه وحقها فى ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها بموجب العقد المبرم بينهما۔

بطاقة الائتمان المتجدد (Credt Card) : هذه البطاقة اداة ائتمان فى حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة وهى ادلة وفاء ايضا، يستطيع حاملها تسديد ائتمان السلع والخدمات والسحب نقدا فى حدود سقف الائتمان الممنوح، فى حالة الشراء للسلع او الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد، كما تسمح له تأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتيب فوائد عليه، اما فى حالة السحب النقدى فلا يمنح حاملها فترة سماح ، ينطبق على هذه البطاقة ماجاء فى البند ٢/٢ه و ، ز۔

الحكم الشرعى لانواع البطاقات : بطاقة الحسم الفورى: يجوز للمؤسسات اصدار بطاقة الحسم الفورى مادام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية، بطاقة الائتمان والحسم الآجل: يجوز اصدار ها بالشروط الآتية:

الا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية فى حال تأخر ه عن سداد المبالغ المستحقة عليه۔

فى حالة الزام المؤسسة حامل البطاقة بايداع مبلغ نقدى ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه يجب النص على انها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة۔

ان لا يشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة وانه يحق للمؤسسة سحب البطاقة فى تلك الحالة۔

بطاقة الائتمانمن المتجدد: لا يجوز للمؤسسات اصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذى يسدده حامل البطاقة على اقساط آجلة بفوائد ربوية۔

(المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية)

ব্যাংক ড্রাফট- (Bank Draft) :

ব্যাংক ড্রাফটের সংজ্ঞা :

A bill of exchang payable on demand, usually drawn by one bank on another or by on branch on another, a popular means of transfer of funds.

অর্থাৎ এটি একটি বিল, যা তলবকারীর ওপর আদায় করা ওয়াজিব হয়। যা সাধারণত এক ব্যাংক থেকে ব্যাংকে অথবা এক শাখা থেকে অন্য শাখায়

আদায় করা ওয়াজিব হয়। এটা টাকা স্থানান্তর করণের গ্রহণযোগ্য সাধারণ পদ্ধতি।

মি. আগারওয়াল ব্যাংক ড্রাফটের সংজ্ঞায় লিখেন :

A bank draft is a cheque drawn by one bank upon another bank or its own branch situated at a different place, requiring it to pay a certain sum of money to a specified person or to his order to the bearer. A bank draft may be anland or foreign. Usually persons who have to make payment to distant creditors go to their bank to obtain a bank draft. they have to deposit with the bankers the amount to be remitted a small commissions. Draft is then issued which is sent to the creditor concerned who gets it encashed. (Intrudaction to Eceonomic prenciples -P-352

ড. আগারওয়ালের পেশকৃত সংজ্ঞার সারমর্ম ও পূর্বোক্ত সংজ্ঞার মতোই তবে এতে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে ব্যাংক ড্রাফট আন্তদেশীয়ও হতে পারে এবং বহির্বিশ্বেও হতে পারে এবং এর ওপর কমিশনও নেওয়া যেতে পারে।

পে-অর্ডার (Pay Order) :

পে-অর্ডারের সংজ্ঞা :

It is a cheque like instruments issued by bank on the request of its customers or in payment of its own expenses of dues, drawn on itself. to pay a specified person. Payment orders are usually issued by the banks on receipt of full amounts involved, which means that it would not be returned unpaid due to lack of fuds, it is also called Bankers Cheques or Cashiers chaques. (Glossary, Banking and finance)

অর্থাৎ এটি চেকের মতো মাধ্যম, যা ব্যাংক থেকে তার গ্রাহকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা ব্যাংকের ব্যয় বা পাওনার স্বার্থে স্বয়ং ব্যাংক তা ইস্যু করে। যাতে একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট উল্লিখিত ব্যক্তিকে পরিশোধ করা যায়। পরিশোধসংক্রান্ত বিধিবিধান সাধারণত ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা উসূল হয়ে যাওয়ার পরেই জারি করা হয়। অর্থাৎ ফান্ড স্বল্পতার অজুহাতে পরিশোধ করা ব্যতীত এটি ফেরত দেওয়া যায় না। এটিকে ব্যাংকার চেক বা ক্যাশিয়ার চেকও বলা হয়।

ব্যাংক ড্রাফট এবং পে-অর্ডারের মধ্যে শরীয়া দৃষ্টিতে কোনো জটিলতা নেই। ব্যাংক উভয়টির ওপর চার্জ গ্রহণ করে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা–১

মাওলানা কাসেম শরীফ

বাংলাদেশে বর্তমানে কয়েক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। মৌলিকভাবে এগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা, সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থারই কিছু শাখা-প্রশাখা আছে। তবে মৌলিকভাবে এই তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের দেশে চলমান। একই দেশে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কেন চালু হয়েছে, কিভাবে চালু হয়েছে–তা জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের কাছে।

মুসলমানদের আগমনের আগে ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রধানকেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্যাগোডা, ভিক্ষুশালা, মনাসটারি, ব্রাহ্মণদের আশ্রম, মঠ ও টোল। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল গির্জাকেন্দ্রিক। এখনো তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাদ্রিদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা স্টেটের নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমর্যাদায় পরিচালিত হয়। ঢাকায় নটর ডেম কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুলসহ পাদ্রিদের পরিচালিত স্কুলের পড়ালেখার মান অনেক ভালো। এগুলো খ্রিস্টানদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

ইসলামের প্রথম যুগে ধর্মীয় শিক্ষা ছিল মসজিদকেন্দ্রিক। মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মসজিদকেন্দ্রিক। উপমহাদেশের প্রথম হাদীস চর্চাকেন্দ্র শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.)-এর স্মৃতিধন্য সোনারগাঁও মাদ্রাসাও ছিল মসজিদকেন্দ্রিক। মুসলমানরা ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। মুসলিম রাজত্বকালে পাক-ভারত উপমহাদেশে বহুসংখ্যক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। মাদ্রাসাগুলো পরবর্তী সময়ে মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া'র তথ্য মতে, 'বঙ্গদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় সুলতানি আমলে (১২১০-১৫৭৬)। এ সময়ে বঙ্গদেশে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মহিসন্তোষে মওলানা তকীউদ্দীন আরাবীর মাদ্রাসা প্রাচীনতম। ১২৪৮ সালে সুলতান নাসিরউদ্দীন, বদরউদ্দীন ইসহাক, মিনহাজউদ্দীন, নিজামউদ্দীন দামিস্কি ও শামসউদ্দীন খাওয়ারিজমী একটি মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করেন, যা এক শতাব্দীকাল কার্যকর ছিল।

মওলানা আবু তাওয়ামা ১২৭৮ সালে সোনারগাঁয়ে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং এটি ছিল তৎকালীন বাংলায় সর্ববৃহৎ মাদ্রাসা। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) গৌড় ও মালদহে বহু মাদ্রাসা স্থাপন করেন। সুলতানি আমলে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে ছিল আরবি, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, সাহিত্য, ফিকাহ ও দর্শন।' (বাংলাপিডিয়া, 'মাদ্রাসা শিক্ষা')

ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা

ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা হয় ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পরপরই। সিন্ধু বিজয়ের হাত ধরে ভারতে মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার যাত্রা শুরু হলেও প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এরও বেশ কিছুকাল পরে। মুহাম্মদ ঘোরী ১২০০ শতকের শেষ দিকে ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৯১ সালে তিনি আজমিরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মোঘল আমলে ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ঘটে। সবার কাছে সে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO-র Studies on Compulsory Education-এ উল্লেখ করা হয়েছে : 'মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিবেচনা করা হতো।' সে আমলে মুসলিম পরিবারের শিশুদের হাতেখড়ি হতো পবিত্র কোরআনের শিক্ষার মাধ্যমে। ইতিহাসবিদ এ আর মল্লিক লিখেছেন : 'বাংলার মুসলমানদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যখন কোনো সন্তানের বয়স চার বছর চার মাস চার দিন পূর্ণ হতো, তখন তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শোনানো হতো। শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা।' (A. R. Mallic, British policy And Muslim in

Bengal, p. 149)

মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারে মুসলিম শাসকদের অবদান প্রসঙ্গে এফ ফজলুর রহমান লিখেছেন : 'ডাবলিও এডমের মতে, সে আমলে অতি সুলভে এমনকি বলতে গেলে বিনা পয়সায় শিক্ষা লাভ করা যেত। প্রতিটি মসজিদ ছিল মুসলিম জনগণের কেন্দ্রীয় আকর্ষণস্থল। আর মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল মাদ্রাসা।' (The Bengali Muslim And English Education, p. 140)

সুলতানি আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা

১৩০০ শতকের প্রারম্ভে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির বাংলার একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল নদিয়া জয়ের মাধ্যমে বাংলায় প্রথমবারের মতো মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সময়ে প্রায় শত বছরের মধ্যেই সারা বাংলায় মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে সারা বাংলাকে একত্রিত করে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন বাংলার মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে এটি প্রায় কয়েক শ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকে। ভারতে 'দিল্লি সুলতানাত' স্থায়ী হয় প্রায় ৩২৫ বছর (১২০১-১৫২৮)। কারো কারো মতে, ৩২০ বছর (১২০৬-১৫২৬)। চারজন তুর্কি ও একজন আফগান বংশোদ্ভূত সুলতান এই সময়ে দিল্লি ও এর আশপাশের এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এ সময়ে ভারতে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ উদ্যোগের একটি প্রধান দিক ছিল মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ। দিল্লিতে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয় শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের আমলে (১২১১-১২৩৬)। তাঁর শাসনামলে গোটা দিল্লি নগরী তদানীন্তন ভারতের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গৌরব ও মর্যাদা লাভ করেছিল। দিল্লি সুলতানাতের পাঁচটি রাজবংশের মধ্যে তুঘলকদের আমলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সবচেয়ে বেশি। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ২৫ বছরের শাসনামলে কেবল দিল্লিতেই প্রায় এক হাজার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) তাঁর রাজত্বকালে শিক্ষা খাতে মোট ১,৩০,০০,০০০ তংকা ব্যয় করেছেন। এ থেকে আলেম ও শিক্ষকরা পেয়েছেন ৩৬,০০,০০০ তংকা। অবশিষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রন্থ প্রকাশনা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হয়।

এ সময় সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর পাঠ ছিল নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য নিষিদ্ধ, এমনকি ধর্মগ্রন্থ শ্রবণ করলেই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। অন্যদিকে মুসলিম শাসকরা ছিলেন শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে উদার। ইসলামে শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কিছুকাল আগেই সুফি-সাধকদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের কাঠামো তৈরি হতে থাকে। সে সময় সুফিদের খানকাগুলো নওমুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময় সুফি-দরবেশদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ ইসলামের মহিমা, দর্শন, ইসলামী জীবনবিধান প্রভৃতি বিষয়ে জানতে শুরু করে। অনেকেই আবার অধিক জ্ঞান অর্জনের আশায় দরবেশদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের আগমন ঘটায় মুসলিম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আসে এবং সুলতানদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবাকতে নাসিরী'র বর্ণনা মতে, বাংলার গৌড়-লখনৌতি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করার পর বখতিয়ার খিলজির নির্দেশে তাঁর কর্মচারীরা সব জায়গায় মসজিদ, খানকা ও মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করে। গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খিলজিও (১২১৩-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) জনকল্যাণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, যদিও তাঁদের কোনো স্থাপনাই এখন আর টিকে নেই। গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খিলজির সময়ের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে, যেখানে ৭ জুমাদাল উখরা ৬১৮ হিজরিতে (২৯ জুলাই, ১২২১ খ্রিস্টাব্দ) একটি খানকা স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সুফিদের খানকাগুলো ছিল ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। খানকাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে অনেক নবীন মুসলিম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। পশ্চিম দিনাজপুরে প্রাপ্ত ৬৪৭ হিজরি (১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) সালের জালালুদ্দিন মাসুদ জানির একটি শিলালিপিতে এবং বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার শীতলমঠে প্রাপ্ত মুগিসউদ্দিন ইউজবুকের ৬৫২ হিজরি (১২৫৪ খ্রিস্টাব্দ) সালের শিলালিপিতে একটি করে পবিত্র ইমারত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর পথের ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায়, এসব ইমারত ইবাদতের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষারও কেন্দ্র ছিল। বাংলার সুলতানি আমলে মুসলিম সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে মসজিদকেন্দ্রিক পরিচালিত

মক্তবে সম্পন্ন হতো। এ কারণে মুসলিম সুলতান ও তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বাংলাজুড়ে যেসব মসজিদ গড়ে উঠেছিল, সেগুলো মুসলিম সমাজের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারেও অবদান রাখত। ৬৯৮ হিজরি সালে জাফর খান কর্তৃক একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় হুগলির জাফর খান গাজীর মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে। শিলালিপির ভাষ্য অনুসারে, নাসির মাহমুদ নামক 'কাজি' (বিচারক) মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে নিজের ব্যক্তিগত আয় থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে শিলালিপির ভাষ্য শুরু করা হয়েছে রাসুল (সা.)-এর একটি হাদীস দিয়ে। এই শিলালিপিতে শিক্ষাকে এমন ঢালস্বরূপ বিবেচনা করা হয়েছে, যা এই ঢাল বহনকারীকে সব রকম অনিষ্ট থেকে দূরে রাখবে। ত্রিবেনির জাফর খানের সমাধিতে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, বাংলার সুলতার শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ কর্তৃক ৭১৩ হিজরিতে (১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ) দারুল খায়রাত নামক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। বাংলার বিখ্যাত সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (রহ.) সুদূর মক্কা ও মদিনায় অর্থ প্রেরণ করে মুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারে দুটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন আরব ঐতিহাসিক ইবনে হাজর (রহ.)-এর 'ইন্‌বাউল গুমর' থেকে জানা যায়, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ নিজে বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। মক্কার উম্মেহানি ফটকের কাছে প্রায় ১২ হাজার মিসরীয় স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে তিনি 'বঙ্গীয় গিয়াসিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। মদিনার বাবুল-ইসলামের কাছে 'হিসানুল আতিক' নামক স্থানে তিনি আরো একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৪১৮-১৪২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসন হিন্দু রাজা গণেশের হাতে থাকে। এ সময় গণেশ কর্তৃক বহু মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস হয়। গণেশের ছেলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সুলতান হন। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক ধ্বংসকৃত মসজিদ-মাদ্রাসা পুনর্নির্মাণ করেন। সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহের ৮৩৫ হিজরিতে (১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ) উৎকীর্ণ রাজশাহী জেলার সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত শিলালিপিতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

সারা বাংলায় সুলতানি আমলের যে শিক্ষাকেন্দ্রটি এখনো প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ হিসেবে টিকে আছে, তা হলো গৌড়ের দরাসবাড়ী। স্থানীয়ভাবে 'দরাসবাড়ী' নামে পরিচিত ধ্বংসস্তূপটি আসলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নির্মিত একটি মাদ্রাসা। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উৎখননে স্থাপনাটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। এখানে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির ভাষ্য অনুসারে জানা যায়, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ৯০৯ হিজরি (১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার সুলতানরা শুধু শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা করেছিলেন তা-ই নয়, বরং সেই সঙ্গে শিক্ষক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানীরও ব্যবস্থা করেছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খিলজি আলেম ও মাশায়েখদের অবসর ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে লখনৌতিতে আগত জালালউদ্দিন নামক একজন প্রখ্যাত সুফিকে দরবারে ডেকেছিলেন বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে তাঁকে সুলতান দরবার থেকে প্রায় আট হাজার রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়েছিলেন। সুলতানি যুগেই ধর্মীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকেই ছিলেন পণ্ডিত, যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের বিভিন্ন শিলালিপিতে। ৮৮৭ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুরের বিরলের একটি মসজিদের শিলালিপি ভাষ্যে মসজিদ নির্মাতাকে আধ্যাত্মিকতার সমুদ্র ও জ্ঞানীদের প্রেমিক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের পাঠ্যক্রমে ইসলামী শিক্ষার বাইরেও আইনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, ভূগোলবিষয়ক জ্ঞান দান করা হতো। সুলতানি যুগে বাংলায় মসজিদ, মাদ্রাসা, সেতু, দুর্গ প্রাচীরসহ বিভিন্ন স্থাপত্য গড়ে ওঠে। সুলতানি আমলে বাংলার বিভিন্ন নগরী ছিল বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র। লখনৌতি, সাতগাঁও, পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ, ঘোড়াঘাট, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিভিন্ন সুফি-আলেমের তত্ত্বাবধানে প্রসিদ্ধ মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। নূর কুতুব উল আলম ফিরোজাবাদে একটি বৃহৎ মাদ্রাসা গড়ে তুলেছিলেন, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের তত্ত্বাবধানে নিষ্কণ্টক জমি দান করেছিলেন। বাংলার সুলতানরা যে শুধু জ্ঞানীদের সহায়তা করতেন এবং মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছেন তা-ই নয়, তাঁরা নিজেরাও ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ নিজে একজন জ্ঞানী ছিলেন, তিনি একজন কবিও ছিলেন। পারস্যেও কবি হাফিজকে তিনি কবিতাসহ পত্র পাঠিয়েছিলেন। জালালুদ্দিন ফতেহ

শাহের ৮৮৯ হিজরি (১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে গুণবন্ত মসজিদের শিলালিপিতে সুলতানকে 'কোরআনের রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী' ও 'ধর্ম ও শরীরবিদ্যায় পণ্ডিত' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন : মো. আবদুল করিম, সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০২ ইং)

মোঘল আমলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা

১১৯৭ সালে বখতিয়ার খিলজির সামরিক অভিযানের পর থেকে মাদ্রাসা ও মক্তব শাসকদের অনুদান পেতে থাকে। বখতিয়ার খিলজি নিজে এবং তাঁর পরবর্তী শাসকরাও বেশ কিছু মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু জয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে যে ইসলামী শিক্ষার শুরু, দিল্লি সুলতানাতের সময় তা খানিকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পাঠ্যক্রমের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষা শুরু হয় মোঘল আমলে। তাই ভারতবর্ষে মাদ্রাসার মূলধারা বলতে বোঝানো হয়ে থাকে মোঘলদের শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসকে।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে ভারতের একটি বিশাল অংশের ক্ষমতা দখল করেন প্রথম মোঘল সম্রাট বাবর। মোঘলরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কি-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। তাঁরা নিজেদের দাবি করতেন চেঙ্গিস খানের বংশধর হিসেবে। পারস্যের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আবেগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। সম্রাট বাবরের হাতে শুরু হওয়া মোঘল আমল শেষ হয় সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মাধ্যমে। ১৫২৬ বা ১৫২৮ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত মোঘলরা রাজত্ব করে। মোঘলদের ক্ষমতায় আসার পর এ অঞ্চলে মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচলন শুরু হয়। মোঘল সাম্রাজ্যের মূল দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসি। উর্দুও খানিকটা চলত, তবে ফারসি ভাষাভাষীদের জন্য রাজদরবারে চাকরি পাওয়ার অগ্রাধিকার ছিল। ২০০ বছরের অধিককাল ধরে শাসন করা এই মোঘল পরিবারের বিভিন্ন শাসকের ব্যক্তিগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে সেই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ।

মোঘল আমলে মাদ্রাসার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। সম্রাট বাবরের আমলের (১৫২৬-১৫৩০) রাজদরবারের কাগজপত্র থেকে জানা যায়, বাবরের প্রশাসন মনে করত, জনগণের শিক্ষা হচ্ছে শাসকের দায়িত্ব। আকবরের আমলে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-১৬২৭) একটি বিশেষ আইন জারি ছিল যে যখন কোনো বিদেশি নাগরিক বা কোনো দেশীয় ব্যবসায়ী কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মৃত্যুবরণ করতেন, তখন তাঁর রেখে যাওয়া ভবনগুলো মেরামত করে মাদ্রাসা কিংবা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হতো।

মাদ্রাসা শিক্ষিত উলামাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে মোঘল শাসকদের। এমনকি কোনো কোনো সম্রাট আলেমদের যুদ্ধক্ষেত্রেও নিয়ে যেতেন প্রয়াজনীয় পরামর্শের জন্য।

মোঘল আমলে আলেমরা প্রধানত তিনটি বিশেষ কাজে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করতেন–

এক. রাজপরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া।

দুই. আদালতে কাজিগিরি বা বিচারকের দায়িত্ব পালন।

তিন. সম্রাটদের বিভিন্ন রকমের দাতব্য কাজকর্মের তদারকি করা।

এ বিষয়ে ইংরেজ ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন : 'কাজী অথবা মুসলমান আইনজ্ঞরা দেওয়ানী আদালতে বিচার করতেন। এমন কি আমরা যখন সর্বপ্রথমে শিক্ষিত আহ্‌লে বিলাতী দিয়ে এ-দেশের বিচার কাজ চালাবার চেষ্টা করলাম, তখনও মুসলমান আইনজ্ঞরা আইনের পরামর্শদাতা হিসেবে তাদের সংগে রীতিমতো উঠাবসা করতেন। ইসলামী বিধি-ব্যবস্থাই এদেশের আইন-কানুন ছিল এবং সরকারী ছোটখাট অফিসগুলি মুসলমানদেরই সম্পত্তি ছিল। তারাই সরকারী ভাষা বলতে পারতো এবং প্রচলিত ফারসী অক্ষরে লেখা সরকারী নথিপত্র একমাত্র তারাই পড়তে পারতো।' (উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, আবদুল মওদুদ অনূদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃ. ১০৯)

এখানে লক্ষণীয় যে 'ইসলামী বিধি-ব্যবস্থাই এদেশের আইন-কানুন ছিল'–হান্টারের এ উক্তির একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে ইসলামবিরোধী আইন-কানুন রচনার যুক্তি হিসেবে যারা বলে বেড়ায়, 'সেক্যুলার রাষ্ট্র কাঠামো হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'–তাদের কথার ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। প্রমাণ হিসেবে হান্টারের উল্লিখিত বক্তব্যই যথেষ্ট।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : সুদ

আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া
নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

বিবরণ–১ : ১৯৭৩ সাল থেকে ব্যাংকে ব্যক্তিগত হিসাব খুলে আমি আমার যাবতীয় অর্থ লেনদেন করে আসছি। এতে বছরান্তে হিসাবের বিপরীতে অতিরিক্ত টাকা অর্জিত হয়, যা সুদ হিসেবে গণ্য। উক্ত প্রাপ্ত সুদের টাকার হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। আমার কর্মজীবনের পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমি সুদ দেওয়া-নেওয়া ও ভোগ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে আসছি। ব্যাংকের হিসাবের বিপরীতে অর্জিত সুদের টাকা ব্যয় করার তরীকা এক আলেমের মাধ্যমে জেনে ১৯৭৩ সাল থেকে প্রাপ্ত উক্ত সুদের টাকা সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতিরেকে অসহায় এতিম-মিসকিনদেরকে এ যাবৎ বিতরণ করে দিয়ে আসছি।

বিবরণ–২ : বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন সচ্ছল-অসচ্ছল ব্যক্তি তাদের বিশেষ ঠেকা দেখিয়ে অনুনয়-বিনয় করে হাওলাত হিসেবে টাকা চাওয়ার প্রেক্ষিতে আমি নিরুপায় হয়ে আমার নিকট রক্ষিত ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের জমাকৃত টাকা (যা তারা জানে না) থেকে তাদেরকে ধার দিই। কিন্তু অনেকেই আজ পর্যন্ত উক্ত ধার হিসেবে গ্রহণকৃত টাকা ফেরত দেয়নি। দীর্ঘদিন বহু চেষ্টা-তদবীর করেও আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছি। ফলে উক্ত খাতের জমাকৃত টাকা থেকে প্রদানকৃত ধারের টাকা বাবদ ব্যয় সমন্বয় করে দেখিয়ে রেখেছি তবে যখনই যার কাছ থেকে ফেরত পাওয়া যাবে তখনই তা বিতরণযোগ্য বলে আমার নিজস্ব সংরক্ষণকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। সাথে সাথে পাওনাদারদের থেকে উক্ত টাকা আদায়ের চেষ্টাও অব্যাহত রেখেছি।

প্রশ্ন-১ : বিবরণ-১-এ বর্ণিত আলোকে ইতিপূর্বে বিতরণকৃত পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক কি না? সঠিক না হলে তা বর্তমানে সংশোধনের উপায় কী?

প্রশ্ন-২ : বিবরণ-২-এ বর্ণিত আলোকে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের জমাকৃত টাকা থেকে ইতিপূর্বে ধার দেওয়া টাকা ফেরত/আদায় না হওয়া পর্যন্ত যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সঠিক কি না? সঠিক না হলে বর্তমানে করণীয় কী?

প্রশ্ন-৩ : বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে যাকাত-ফিতরা খাতে আদায়কৃত টাকা হীলা বা কৌশল অবলম্বন পদ্ধতিতে যেভাবে ব্যয় করা হয় ব্যাংকিং হিসাবের বিপরীতে অর্জিত সুদের টাকা সেভাবে হীলা বা কৌশল অবলম্বন পদ্ধতিতে ব্যয় করা যাবে কি না? গেলে বিস্তারিত পরামর্শদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

সমাধান :

১. আপনার বর্ণিত বিতরণকৃত পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হয়েছে।

২. আপনার জন্য ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের জমাকৃত টাকা ধার দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হয়নি। বরং এ ধরনের টাকা জমা করে না রেখে কাউকে ধার না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অসহায়-গরিবদেরকে সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত সদকা করে দেওয়া জরুরি। অতএব সুদের যে পরিমাণ টাকা ধার দিয়েছেন তাড়াতড়ি তা উসূল করে গরিবদেরকে সদকা করে দেবেন, অন্যথায় আপনার নিজের থেকে ওই পরিমাণ টাকা গরিবদেরকে সদকা করে দিতে হবে।

৩. দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি প্রয়োজনে যাকাত-ফিতরার টাকা শরীয়তসম্মত পন্থায় হীলা করে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সুদের টাকা প্রথমত ব্যাংক থেকে নেওয়া উচিত নয়। নিয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি তা সদকা করে দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে হীলা করে উক্ত টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যায় না। (মিশকাত শরীফ- ২/৫৪৪, ফাতহুল কদির ৭/১৯৬, ফতওয়াতে হিন্দিয়া ৫/৩৪৯)

প্রসঙ্গ : ডিভোর্স

মামুন আহমেদ

জিজ্ঞাসা :

আমি মুহাম্মদ মামুন, আমাকে আমার স্ত্রী রংপুর জেলা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে লিখিত ডিভোর্স প্রদান করে, এখন আমার জানার বিষয় হলো, স্ত্রী স্বামীকে এভাবে ডিভোর্স দিলে তা শরীয়তসম্মত হবে কি না? এবং কাবিননামায় যে শর্তসমূহ দেওয়া ছিল স্বামী যদি তার কোনো একটিও ভঙ্গ না করে থাকে তাহলে স্ত্রী তালাক দিলে সেটা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক দেওয়ার অধিকার একমাত্র স্বামীর, তবে স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করে থাকলে স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তালাকে তাফবিজের ক্ষমতাবলে নিজেকে তালাক দিতে পারে। আপনি যেহেতু শর্ত সাপেক্ষে আপনার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করেছিলেন, তাই বাস্তবেই যদি আপনি কাবিননামায় উল্লিখিত কোনো শর্ত ভঙ্গ না করে

থাকেন তাহলে আপনার স্ত্রীর জন্য তার ওপর তালাকে তাফবিজ দেওয়ার অধিকার অর্জন হয়নি। সুতরাং আপনার স্ত্রী আপনাকে যে তালাক দিয়েছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক হিসেবে গণ্য হবে না এবং এর দ্বারা আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্কও ছিন্ন হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৩৫, রদ্দুল মুখতার ৩/৩৩৫, ফতওয়ায়ে উসমানী ২/৪০৩)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা. সোহেল (স্বামী)
মতলব, চাঁদপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমার পিতা কামভাবের সাথে আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করে তার গলা ও পেটে হাত লাগায় এবং পুত্রবধূও তাতে সন্তুষ্ট থাকে। পরবর্তীতে একে অপরকে খারাপ বা দুষ্টু বলে প্রকাশ করে তাহলে উক্ত মাসআলার বিধান কী? ইসলামী শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনায় বাস্তবেই কামভাবের সাথে স্পর্শ করে থাকলে এবং এর দ্বারা বির্যপাত না হলে আপনার স্ত্রী আপনার ওপর আজীবনের জন্য হারাম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আপনার কর্তব্য হবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দেওয়া। (সূরা নিসা-২৩, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৩, বাহরুর রায়েক ৩/১৭৩)

প্রসঙ্গ : ব্যাংক

আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া
নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

অবসরোত্তর সরকারি চাকরিজীবীদের প্রাপ্ত টাকা ব্যাংকের নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করে সুদবিহীনভাবে সুবিধা ভোগের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক পরামর্শদানের আবেদন।

বিবরণ-১ : আমার সরকারি চাকরির সীমিত আয়ের সংসারে ব্যয় মেটাতে কষ্ট হওয়ায় অতিরিক্ত আয়ের উদ্দেশ্যে কর্মজীবনের প্রথম থেকে দ্বীনি-বেদ্বীনি বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যবসার সাথে পুঁজি বিনিয়োগ করেও দেখেছি যে এ পর্যন্ত যেসব ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেন করেছি আমার পুঁজির বিপরীতে লভ্যাংশ দেওয়া দূরে থাকুক শেষ পর্যন্ত আসল টাকাও ফেরত দেয়নি।

বিবরণ-২ : বর্তমানে আমি সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা। এ বয়সে ব্যক্তিগতভাবে পরিশ্রম করে ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সন্তানাদির মধ্যেও কেউ উপযুক্ত নেই উপরন্তু বিবরণ-১-এ বর্ণিত অভিজ্ঞতার আলোকে অন্য কাউকে পুঁজি দেওয়া অথবা অন্য কারো ব্যবসায় পুঁজি বা শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। আবার অবসরোত্তর প্রাপ্ত টাকা দ্বারা আয়ের চেষ্টা-তদবির না করলেও এ সীমিত টাকা কয়েক বছরের মধ্যে অবশ্যই ফুরিয়ে যাবে।

বিবরণ-৩ : বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত (যা হয়তোবা আপনিও অবগত আছেন) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে নানা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যাতে শুধুমাত্র যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁর অবসরোত্তর প্রাপ্ত টাকা স্ব-স্ব বিভাগ থেকে উত্তোলন করার পর ইচ্ছে করলে যেকোনো ব্যাংকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে তার বিপরীতে অর্জিত আয় মাসে মাসে ভোগ করার সুযোগ আছে।

প্রশ্ন : বিবরণ-১ ও ২-এ বর্ণিত আলোকে বিবরণ ৩ মোতাবেক আমার চাকরির অবসরোত্তর প্রাপ্ত টাকা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে সুদবিহীন আর্থিক সুবিধা ভোগ করার জন্য সুযোগ আছে কি না? যদি সুযোগ থাকে তবে কোন কোন ব্যাংকে এবং কোন কোন পদ্ধতিতে? মুহতারাম উপরোক্ত বিষয়ে সঠিক পরামর্শদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

সমাধান :

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক নামে পরিচালিত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পরিষদ শরীয়া নীতিমালা অনুযায়ী ডিপোজিটারদের টাকা বিনিয়োগ করে তাদেরকে মুনাফা প্রদান করার দাবি করে থাকে এবং তা তদারকির জন্য উলামায়ে কেরামের খেদমত নিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তাদের দাবির বরখেলাপ কোনো কিছু প্রমাণিত না হলে উক্ত ইসলামী ব্যাংগুলোতে টাকা বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গ : উশর

মুহা. নোমান বিন নূরুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

জিজ্ঞাসা :

উশরী ও খারাজি জমি বলতে কী বোঝায়? এর শরয়ী হুকুম কী? বর্তমান বাংলাদেশের জমি উশরী না খারাজি? আমাদের পক্ষ থেকে সরকারকে জমির যেই টাকা দেওয়া হয় তা খারাজ হিসেবে গণ্য হবে কি না? বিস্তারিত দলিল সহকারে জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

যে জমি বর্তমানে মুসলমানদের হাতে আছে এবং ধারাবাহিক মুসলমানদের হাতেই মালিকানা পরিবর্তন হয়ে আসছে তা উশরী। আর যে জমি অমুসলিমদের হাতে আছে অথবা পূর্বে কোনো সময় অমুসলিমদের মালিকানায় ছিল তা জানা থাকলে খারাজির অন্তর্ভুক্ত। আর যে জমি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস জানা না থাকে তবে তা বর্তমানে মুসলমানদের হাতে আছে, তাও সতর্কতামূলক উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে কোনো জমি যদি খারাজির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সরকারকে দেওয়া ট্যাক্স খারাজ হিসেবে গণ্য হবে। তবে উশর ফকির-মিসকিনের হক্ব বিধায়

তা কোনো অবস্থাতে সরকারি ফান্ডে দেওয়া যাবে না, বরং যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকিনদের দিয়ে দেবে। (ফাতহুল কদির ৬/৩০, হেদায়া মা'আ ফাতহিল কদির ২/১৫০, ইমদাদুল আহকাম ২/৩৬)

প্রসঙ্গ : প্রভিডেন্ট ফান্ড

এম. জহিরুল আলম
রিসার্চ অফিসার, বাংলাদেশ
বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমি রাষ্ট্রের সেবক, সেবার বিনিময়ে যা আমার মজুরি নির্ধারিত তার একটা রাষ্ট্রীয় সেবার বাহিরে যাঁরা সেবা দেন তাঁদের কনট্রিবিউটরি ফান্ড রয়েছে। অর্থাৎ মজুরি থেকে একটা অংশ কেটে রাখা হয়, আবার ওই ফান্ডে মলিকপক্ষ কিছু টাকা কনট্রিবিউট করে, এভাবে একটি ফান্ড হয়, আর আমাদের মালিক রাষ্ট্র। তার পরিচালক সরকার। সরকার তার কর্মীদের মজরি হতে জমানো টাকার ওপর শতকরা হারে কনট্রিবিউট করে আরবীতে যেটি রিবা বাংলা আবিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, সেটিকে ইসলামে পরিষ্কার হারাম করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, আমার মালিকপক্ষ আমাকে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড বা বেসরকারি কনট্রিবিউটরি ফান্ডের টাকার ওপর সরকার মালিক হিসেবে অথবা বেসরকারি মালিকগণ যেটুকু কনট্রিবিউট করেন তা জঘন্য পাপ রিবা হবে কি না? এ বিষয়ে অনেকের অনেক মত জানতে পারলাম, মুহতারামের কাছে কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক সমাধানের অনুরোধ রইল।

সমাধান :

বাধ্যতামূলক কর্তনকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার ওপর সরকার মালিক হিসেবে অথবা বেসরকারি মলিকগণ যেটুকু কনট্রিবিউট দিয়ে থাকেন তা রিবা বা সুদ নয়। অতএব আপনার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে। (ইসলাম আওর জদীদ মা'আশি মাসায়েল ৪/৮৭, কেফায়াতুল মুফতী ৮/৯৬)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের জামাআতে নামায

গণি মিয়ার হাট জামে মসজিদ কমিটি
২০ নং দেবীদাস ঘাট লেন, চকবাজার।

জিজ্ঞাসা :

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদ চকবাজারের অদূরে আমাদের দেবীদাস ঘাটস্থিত গণি মিয়ার হাট জামে মসজিদটি শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদ হিসেবে বিবেচিত ও পরিচিত। আমরা মসজিদ কমিটি সর্বদা মসজিদের উন্নয়নের জন্য এবং মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য মানুষকে প্রকৃত মুসল্লি হওয়ার দাওয়াত দিতে সচেষ্ট থাকি। এরই প্রেক্ষিতে আমরা নতুন করে এক দাওয়াতি উদ্যোগ নেওয়ার প্রচেষ্টা করছি, যা প্রথমত কোরআন ও হাদীসের আলোকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে যাচাই করার অত্যাবশ্যকীয়তা অনুভব করছি।

প্রশ্ন : পুরুষগণ যেভাবে দুই ঈদ এবং জুমু'আর নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায মসজিদে এসে জামাআতের সাথে আদায় করে তদ্রূপ মহিলাদের জন্যও যদি মসজিদের ইমামের পেছনে দুই ঈদ এবং জুমু'আর নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের ব্যবস্থা করা হয় এবং মহিলারা যদি জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায তাফসীর ও বয়ান শ্রবণ করাসহ ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী মসজিদে এসে করে তা কোরআন ও হাদীসের আলোকে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না থাকে তাহলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার মসজিদসমূহের মধ্যে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, গুলশান আজাদ মসজিদ, গাউসূল আজম মসজিদ এবং ধানমণ্ডিসহ বেশ কিছু স্থানে নামিদামি মসজিদে দেখা যায় মহিলাদের জন্য জামাআতে নামায আদায় করার জন্য সুব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেখানে মহিলারা জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছে। এর কারণ কী? যদি মহিলাদের জন্য মসজিদে এসে জামাআতে নামায আদায় করা বৈধ হয় তাহলে কোন কোন নিয়মে বা পন্থায় মহিলারা মসজিদে আসবে এবং নামায আদায় করবে? তার ব্যাখ্যা জানিয়ে কৃতজ্ঞায় আবদ্ধ করবেন। পুরুষগণ যেই মসজিদে নামায আদায় করে থাকেন সেই একই মসজিদে মহিলারাও জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে কি না? যেমন পুরুষগণ মসজিদের প্রথম তলাতে মহিলারা দ্বিতীয় তলা কিংবা তৃতীয় এবং চতুর্থ তলাতে এভাবে একই মসজিদে পুরুষ ও মহিলা আলাদা আলাদা একই জামাআতে নামায পড়তে পারবে কি না? মসজিদের ভেতরে একই যাতায়াত এর সিঁড়ি, অজুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানা ব্যবহার করা যাবে কি না?

সমাধান :

মহিলাদের অবস্থা ও অবস্থান লক্ষ রেখে শরীয়ত কর্তৃক মহিলাদের জন্য ফরজ নামাযের জামাআত, জুমু'আ ও ঈদের নামায ওয়াজিব করা হয়নি। পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বরং নবী করীম (সা.) মহিলাদের জন্য মসজিদে নববীতে জামাআতে নামায পড়ার চেয়ে বাড়ির অন্দরমহলে নামায পড়া উত্তম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু মদীনা শরীফে রাসূল (সা.)-এর যুগে ৯-১০টি মসজিদ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মসজিদে নববীতে রাসূল (সা.)-এর কারণে মহিলাদের আসার অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে উক্ত কারণ বিদ্যমান না থাকায় হযরত ওমর (রা.) ও আয়েশা (রা.)সহ সাহাবায়ে কেরামের যুগে মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই ১৪ শত বছর পর ভয়াবহ এ ফেতনার যুগে মহিলাদের জামাআতে নামায পড়া, জুমু'আ ও ঈদের নামায পড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা কিছুতেই শরীয়ত সমর্থিত হতে পারে না। (সূরা আহযাব-৩৩, বুখারী শরীফ ১/২৬১, আদ দুররুল মুখতার ১/৮৩)

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে

যুগের আবু হানীফা

মুফতী শরীফুল আজম

ইমামে আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনী পড়ে শিক্ষণীয় যা কিছু পাওয়া যায় তার হুবহু নকল হযরতওয়ালার (রহ.) জীবনেও লক্ষ করা যায়। ইমাম আজমের (রহ.) পদাঙ্ক অনুসরণের সিদ্ধান্ত হয়তো তিনি নিয়েই রেখে ছিলেন। ইলম, হেকমত, রিয়াজত-মুজাহাদা, যোহদ-তাকওয়া, মো'আমালা-মো'আশারা, দূরদর্শিতা বা জাগ্রত মেধা। মোট কথা, যেকোনো দিক ধরা হোক হযরতওয়ালা (রহ.) ছিলেন এ সকল ক্ষেত্রে ইমামে আজম (রহ.)-এর প্রতিচ্ছবি।

জন্মগত ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য :

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ লিখেন–

كان ابو حنيفة حسن الوجه حسن اللحية حسن الهيئة والثياب حسن النعل حسن المجلس حسن السمت هيوبا شديدالكرم كثير المواساة لاخوانه كثير التعطر كان اذا خرج من منزله يعرف بريح المسك قبل ان يراه الناس۔ (تاريخ الاسلام للذهبى ٦/١٣٥، مكانه الامام ابى حنيفة بين المحدثين ٥٢)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর চেহারা ছিল আকর্ষণীয়, সুন্দর শ্মশ্রুমণ্ডিত, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি, পাদুকা উন্নত, মজলিস প্রাণবন্ত, কর্মপন্থা গোছালো, তিনি ছিলেন ভীতিকর ব্যক্তিত্বের অধিকারী পরম দয়ালু। সকলের হিতৈষী সমব্যথী, তিনি খুব বেশি আতর ব্যবহার করতেন, ঘর থেকে যখন বের হতেন মানুষ তাঁকে দেখার পূর্বে তাঁর আতরের সুগন্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। এ সকল বৈশিষ্ট্যে হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন হুবহু ইমাম আজম (রহ.)-এর মতো। হযরতের দৈহিক গড়ন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শ্মশ্রুমণ্ডিত নুরানী চেহারা প্রথম সাক্ষাতেই যে কেহ অনুমান করতে পারত যে তিনি অসাধারণ কোনো ব্যক্তি হবেন। একবার হযরতওয়ালা (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের মেহমানখানায় অবস্থান করছিলেন। সাথে ছিলেন মুফতী সুহাইল সাহেব (দা.বা.) জনৈক বয়োবৃদ্ধ লোক হযরতওয়ালাকে দূর থেকে দেখে মন্তব্য করলেন যে ইনি অনেক বড়মাপের আলেম হবেন। মুফতী সুহাইল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি উনাকে চেনেন? লোকটি বলল, চিনি না, তবে এমন বড় আকারের কান যাঁদের হয় তাঁরা অনেক বড় আলেম হয়ে থাকেন। দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুহতামীম ক্বারী তৈয়্যব সাহেব (রহ.)-এর কান এমন বড় বড় ছিল। পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে হযরতওয়ালা (রহ.) ছিলেন অতুলনীয়। জামা, কাপড়, জুতা-মোজাসহ ব্যবহারের সকল কিছুই ছিল নামিদামি ব্র্যান্ডের। বাহারি খানাপিনার নানা পদ থাকত সদা প্রস্তুত। অদ্ভুত এক শাহী জিন্দেগী। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এমন সব নেয়ামতের মাঝেই কাটে হযরতের শেষ জীবন। আল্লাহওয়ালাদের শুরু জীবনের কষ্ট মুজাহাদার ফল শেষ জীবনে এভাবেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। হযরতওয়ালা (রহ.) সদা আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতেন আর বলতেন আমার শায়খের দু'আর ফসল এ সকল নেয়ামতরাজি।

শায়খের দু'আর ফল :

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহ.)-এর সোহবতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। সাহারানপুরের ঐতিহাসিক খানকাহে অবস্থানকালে হযরতওয়ালা (রহ.) রিয়াযত মুজাহাদার বে-নজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। খুব সামান্য খাবার গ্রহণ করে রাত-দিন বিভিন্ন যিকির-শোগলে মশগুল হয়ে থাকতেন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিছানা ছাড়া খালি চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে পড়তেন। বিষয়টি হযরত শায়খ জাকারিয়া (রহ.)-এর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি হযরতওয়ালা (রহ.)-কে ডেকে বললেন :

میاں کھانا کم نہ کھانا اور چٹائی پر نہ سونا

মিয়া! খানা কম খাবে না আর চাটাইয়ের ওপর ঘুমাবে না।

বহু মজলিসে এ ঘটনা শুনিয়ে হযরতওয়ালা (রহ.) বলতেন, শায়খের ওই উপদেশ আমার জন্য দু'আয় পরিণত হয়েছে। আজ যে দামি দামি খাটপালঙ্কে ঘুমাচ্ছি আর বেশুমার নেয়ামত ভক্ষণ করছি এর সবই শায়খের দু'আর ফসল। তাহাজ্জুদের সময় থেকে খাওয়া শুরু করি সারা দিন থেমে থেমে চলতে থাকে। আমি ডায়াবেটিসের রোগী। ডাক্তাররা আমার খাদ্য তালিকা দেখলে অবাক হয়ে যান কিন্তু খাবার খেতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আলহামদুলিল্লাহ খুব

খেতে পারি।

প্রাণবন্ত মজলিস :

হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মজলিসে বসতে পারার অনুভূতি ছিল চরম আনন্দের। সার্থক মনে হতো জীবনের ওই সময়টুকু। মন জুড়িয়ে যেত আধ্যাত্মিক নূরের ঝলকে। বড়ই সৌভাগ্যবান যারা তাঁর সোহবত লাভে ধন্য হয়েছে। হযরতের মজলিসে কাউকে ডেকে পাঠানো হলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেত তার মন। ডেকে যা-ই বলুক না কেন তৃপ্তি মিলত তাতেই। বকাঝকা করলেও অন্যদের তা শুনিয়ে গর্ববোধ করত। হযরত (রহ.)-এর মজলিসে হাজির হওয়া মানেই আপ্যায়িত হওয়া। কথার ফাঁকে বেল টিপে খাদেমদের নাশতা দিতে বলতেন। অনেক সময় নাশতার মেন্যু কী হবে তাও বলে দিতেন। অতঃপর মজলিস থেকে ফেরা হতো মাদানী দস্তরখানে আপ্যায়িত হয়ে। রুহানী ফয়েয বরকতে প্লাবিত হয়ে। ইলম ও হেকমতের কোনো না কোনো বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়ে। এমন প্রাণবন্ত আর শিক্ষণীয় ছিল ইমাম আজম (রহ.)-এর মজলিস।

হযরতওয়ালা (রহ.)-এর জানাযায় উপস্থিত মেয়র আনিসুল হক সেদিন নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি হুজুরের কাছে যখনই যেতাম মনের ভেতর এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করতাম।

গোছালো কর্মপন্থা :

হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাতের (রহ.) প্রতিটি কাজ ছিল গোছালো। যথাসময়ে যথার্থভাবে সম্পাদন করতেন সকল কর্ম। তিনি ছিলেন এক কর্মবীর। আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের আয়োজন দেশব্যাপী যে শৃঙ্খলার সাথে তিনি আঞ্জাম দিতেন তা দেখে হতবাক হয়ে যেত সকলে। তাঁর এই কর্মচাঞ্চল্য দেখে আওলাদে রাসূল (সা.) সৈয়্যদ আব্দুল মজিদ নদীম (রহ.) মন্তব্য করে ছিলেন যে হযরত মুফতী সাহেব একাই এক হাজার লোকের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

পটিয়া মাদরাসায় থাকতে একবার পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করতে বিলম্ব হয়ে যায়। যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করার স্বার্থে হযরতওয়ালা (রহ.) হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম বোখারী সাহেব (দা. বা.)-কে সঙ্গে নিয়ে এক রাতে ৩০ কেন্দ্রের নম্বর যোগ করে ফেলেন। এভাবে অনেক কাজ যথাসময়ে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি বিনিদ্র রজনী কাটাতে অভ্যস্ত ছিলেন।

মসজিদের অভ্যন্তরীণ মাইক, সাউন্ড বক্স ইত্যাদির মাঝে যান্ত্রিক গোলযোগ বা আওয়াজ ঠিকভাবে না পৌঁছানো মুসল্লিদের জন্য একটি বিরক্তিকর অধ্যায়। এ বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা কমবেশি সকলেরই আছে। হযরতওয়ালা (রহ.) ছিলেন এ বিষয়ে খুবই সজাগ-সচেতন। মারকাযের মসজিদে সাউন্ড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার ডেকে এনে নকশা তৈরি করিয়েছেন। দেশি-বিদেশি বহু মূল্যবান মেশিনারিজ স্থাপন করে আওয়াজ সুন্দর করার ব্যবস্থা করেছেন। মসজিদের বাইরে জানাযার নামায সুষ্ঠুভাবে আদায়ের সুবিধার্থে যোগ করা হয়েছে ওয়্যারলেস সেট। হযরতের এমন সব ইন্তেজাম ও পরিচালনা দক্ষতা দেখে যে কেউ মুগ্ধ হয়ে যেত। মোট কথা, ইমাম আজম (রহ.)-এর মতো হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মাঝেও এমন সব প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যায়।

নিজে করি :

প্রথমে নিজে করি–এ মনোভাব হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মাঝে বদ্ধপরিকর ছিল। যেকোনো কাজকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে এটি একটি জাদুময়ী দর্শন। হুদায়বিয়ার সন্ধির কঠিন মুহূর্তে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পরামর্শে নবীজি (সা.) প্রথমে নিজে কেশ মোবারক মুণ্ডে ফেলায় সকলকে আমল করানো সহজ হয়েছিল। হযরতওয়ালা (রহ.) যে কাজ সকলকে দিয়ে করাতে চাইতেন প্রথমে নিজে তা করতেন। নামাযের পরে মসজিদে বিভিন্ন মামুলাত, দু'আ ইত্যাদির আমল হযরতওয়ালা (রহ.) নিজেই পরিচালনা করতেন। দরস আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দু'আর যে মজলিস তারানা নামে পরিচিত তাতে সকল ছাত্র-শিক্ষককে উপস্থিত করতে তিনি নিজেই সেখানে উপস্থিত হতেন এবং অন্যদের আগেই পৌঁছে যেতেন। যার ফলে সকলে সতর্ক হয়ে যেত।

আযানের সাথে সাথে দরস-তাদরীসসহ সকল কাজকর্ম বন্ধ করে মসজিদে চলে যেতে সকলের প্রতি জোর তাগিদ দিতেন। এর বাস্তবায়নেও নিজে করি ফর্মুলা কাজে লাগাতেন। আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর হুইল চেয়ার রুম থেকে বের হয়ে আসত এবং সবার আগে নিজে মসজিদে হাজির হয়ে যেতেন। যথাসময়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার জন্য আযানের আগেই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতেন। সময়ানুবর্তিতার চিরাচরিত এ অভ্যাসের মাঝে বয়সের ভার কোনো রূপ ছেদ ঘটাতে পারেনি।

দয়ার সাগর :

হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একধরনের রুউব ছেয়ে থাকত। অপরিচিত কেহ দেখলেও সমীহ করতে বাধ্য হতো। অনেক সময় বাহ্যিকভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী দয়ার্দ্র ও ক্ষমাশীল এক মুরশিদে কামেল। মুখে কাউকে রাগডাক দিলেও মন থেকে তাকে ঠিকই স্নেহ করতেন। মুরিদের ইসলাহের তরে মাশায়েখে কেরামের এটি একটি কৌশল বা কর্মপন্থা মাত্র। শুধু তা-ই নয়, দারুল ইকামার জিম্মাদার উস্তাদগণকেও তিনি ছাত্র নেগরানীর ক্ষেত্রে এই কৌশল অবলম্বনের কথা বলতেন। তিনি বলতেন দারুল ইকামার জিম্মাদারদের চোখ থাকবে লাল কিন্তু অন্তর থাকবে নরম। মাতৃ স্নেহে ছাত্রদের তারবীয়তের

চেষ্টা করতে হবে।

গরম-নরমের এ সমন্বয়কে অনেকে সাংঘর্ষিক মনে করে ভুল বুঝতে পারে। তাই ব্যাপারটি আরেকটু খোলাসা করা যেতে পারে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এক মুরিদকে খুব বকাঝকা করে তাড়িয়ে দিলেন, কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এসে হযরতের কাছে মাফ চাইতে লাগল, হুজুর আপনাকে অসন্তুষ্ট করে ফেলেছি আমাকে মাফ করে দিন। হযরত থানভী (রহ.) বললেন, আমি যে তোমার ওপর অসন্তুষ্ট এর প্রমাণ কী? মুরিদ বলল, এই যে আমার সাথে রাগ করলেন তা থেকে আন্দাজ করেছি। হযরত বললেন, যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতাম তাহলে তোমার ওপর রাগ করতাম না। মহব্বত আছে বলেই তোমার সংশোধনের জন্য রাগ করেছি। বস্তুত আল্লাহওয়ালাগণ নিজের মুরিদ বা ছাত্রকে রাগ করে বকাঝকা করেন মূলত ইসলাহের উদ্দেশ্যে এবং তার প্রতি মহব্বতের তাড়নায়। মুরিদ যদি তা অনুধাবন করে সঠিক পথে চলতে থাকে তবে ভবিষ্যতে নিজেই এর সুফল ভোগ করবে।

হারদূয়ী হযরতের (রহ.) খলীফা মুনসী আসরারুল হক (রহ.) যিনি দীর্ঘদিন হারদূয়ীতে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। একবার হারদূয়ী হযরত (রহ.) তাঁকে রাগ করে খানকাহ থেকে বের করে দেন। বিভিন্ন মানুষ এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলে তিনি একটি পঙ্‌ক্তি শোনালেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো–

یہ انکا ڈانٹنا پٹکارنا تنبیہ فرمانا
محبت کی علامت ہے ارے ناداں نہ گھبرانا
بھگانا ہے بھگانے دو بھگا کر پھر بلائیں گے
مجھے بے چین کرکے وہ بھلا کب چین پائیں گے

তাঁর এই বকাঝকা আর ধমকসমক মূলত মহব্বতের লক্ষণ। আরে বোকা এতে ঘাবড়াবে না। তাড়িয়ে দিলে তাড়াতে দাও। তাড়াবে আবার বুকে টেনে নেবে। আমাকে অস্থির করে তিনি কি শান্তি পাবেন?

মুরিদের মাঝে যদি এমন দৃঢ়তা থাকে তবে সে অবশ্যই মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে। আর যদি দু-একটি ঝাঁকুনি খেয়ে পিছলে যায় তবে তার ইসলাহ আর সংশোধন দুরূহ ব্যাপার। হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) কারো প্রতি রাগ করলে ভর্ৎসনা করলে সেটা হতো তার প্রতি মহববতের পরিচায়ক। পরক্ষণে আবার তাকে কাছে টেনে মমতার চাদরে ঢেকে নিতেন।

বদান্যতা :

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে থেকে পড়ালেখা করেছিলেন। এ সময় তাঁর এবং তাঁর পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার ইমাম আজম (রহ.) বহন করতেন। এমন বহু ছাত্রের লেখাপড়া ইমাম আজম (রহ.)-এর খরচে চলত বছরের পর বছর। এটা তাঁর সাখাওয়াত, বদান্যতা আর মেহমানদারীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তালিবুর ইলমদের নিয়েই ছিল তাঁর পরিবার।

হযরত ফকীহুল মিল্লাহ (রহ.)-এর জীবনেও লক্ষ করা যায় বদান্যতার হুবহু অনেক ঘটনা। আলেম আর তালিবুর ইলমদের নিয়েই ছিলে তাঁর সংসারধর্ম। কোনো আলেম বা তালিবুল ইলমের জন্য কিছু করতে পারলেই যেন তিনি প্রশান্তি পেতেন। যাকে যেভাবে পেরেছেন সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। দুই হাত উজাড় করে দিয়েছেন। না থাকলে কর্জ করে হলেও দিয়েছেন। কোনো আলেম বিপদগ্রস্ত হলে তার পরিবারের খোঁজখবর নিতেন। মাসে মাসে বাজার-সদাই করে পাঠানোর মতো দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। আর এসব করতেন গোপনে। এক হাতে ব্যয় করলে অপর হাত জানতে পারত না। ব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বেতুয়ার মুহতামীম মাওলানা মাহমুদুল হক সাহেব সেদিন বললেন যে হযরত যখন কাউকে টাকা-পয়সা দিতেন তখন মনে হতো তিনি হাত থেকে ময়লা দূর করলেন।

একবার ফেনী রশিদিয়া মাদরাসায় হযরতওয়ালার (রহ.) সফর ছিল। গিয়ে দেখলেন বিশাল আম বাগান। থোকায় থোকায় আম ধরে আছে। একদম মাটি ছুঁইছুঁই। মনকাড়া চমৎকার দৃশ্য। অপূর্ব নেয়ামতরাজি। ফল বাগান ওই মাদরাসার অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। হযরত খবর নিয়ে জানতে পারলেন সব আম বিক্রি করে দেওয়া হয়, ছাত্রদের খাওয়ানো হয় না। তিনি যারপরনাই ব্যথিত হলেন। বললেন, এটা কেমন কথা, এত সুন্দর সুন্দর আম ছাত্ররা আমানতদারীর সাথে দেখেশুনে রাখে অথচ তাদের খেতে দেওয়া হয় না! আমার পক্ষ থেকে সব ছাত্রকে একটি করে আম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কেজিতে কয়টি হয় আর কয় কেজি লাগে আমাকে জানান। যেই কথা, সেই কাজ। সকলে হতবাক। ছাত্রদের জন্য আমের ব্যবস্থা হয়ে গেল। হযরতের সাথে আমের মূল্য পরিশোধের মতো টাকা ছিল না। ফেনী শহরে হযরতের এক ছাত্র আছেন, বিত্তশালী। সাথেই ছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা কর্জ নিয়ে আমের দাম পরিশোধ করে দিলেন।

২০০৭ সালে সিডরের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণবঙ্গের জনপদে বহুজন বহু পদ্ধতিতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কিন্তু হযরতওয়ালার (রহ.) চিন্তা ছিল আলেম-উলামাদের নিয়ে। লাইন ধরে হুড়াহুড়ি করে ত্রাণ নেওয়া তাঁদের পক্ষে তো আর সম্ভব হবে না। তাই শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত আলেম-উলামাদের তালিকা করে তিনি সসম্মানে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেন সাধ্যের সবটুকু। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সকল দুর্যোগে তিনি এমন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলেম ও তালিবে ইলমদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বের কথা। জটিল

রোগে আক্রান্ত একজন আলেম চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভর্তি হন বসুন্ধরার অ্যাপোলো হাসপাতালে। এখানকার চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল তা বলাই বাহুল্য। অনেক টাকা বিল হলো। একজন আলেমের পক্ষে যা পরিশোধ করা কষ্টকর। এমন পরিস্থিতিতে হযরতওয়ালা (রহ.) তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। বসুন্ধরার নিয়মিত মুসল্লি অ্যাপোলো হাসপাতালের ডাক্তার শাহরিয়ার সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। বিলের খোঁজখবর নিয়ে সম্পূর্ণ বিল নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে একজন আলেমকে চিন্তামুক্ত করলেন।

পরিবারের সদস্যদের জন্যও মানুষ এতটা করে না আলেম ও তালিবে ইলমের জন্য হযরত যতখানি করে গেছেন। ইমাম আজম (রহ.)-এর মতোই আলেম ও তালিবে ইলমদের নিয়েই ছিল তাঁর সংসার।

২০০৯ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। এক মুখলিস দোস্ত হযরতের পরিবারের সদস্যদের হজ করানোর প্রস্তাব দিল। হযরত (রহ.) বললেন, আমার পরিবার তো অনেক বড়। তিনি বললেন অসুবিধা নেই সকলের পাসপোর্ট জমা দিয়ে দেন। হযরত কাদেরকে পাঠালেন এটাই হচ্ছে এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য। হযরত তাঁর অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন মাদরাসা থেকে বাছাই করে যে সকল উস্তাদ হজ করেননি এমন ২৮ জনকে হজে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন বটে নিজের সন্তানদের পাঠালেন না। হজের জন্য মানুষ সারা জীবন কত সাধনা করে, চেষ্টা করে, টাকা-পয়সা জমায়। হজের তামান্না নিয়েই কত মানুষ এ ধরা ত্যাগ করে পাড়ি দেয় পরপারে। আর মাত্র একটি ইশারায় ২৮ জনের অকল্পনীয় হজের ব্যবস্থা। তাদের সকলের হজের সাওয়াব কি হযরত পাবেন না? অবশ্যই পাবেন এবং তাদেরটা কবুল না হলেও তিনি এতগুলো মকবুল হজের সাওয়াব পেয়ে যাবেন।

আতর ব্যবহার :

ইমাম আজম (রহ.)-এর মতো হযরতওয়ালা (রহ.) ও বেশি বেশি আতর ব্যবহার করতেন। হযরতের আতরের ঘ্রাণ অনেক দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসত। মারকাযের পূর্ব দিকের একেবারে দক্ষিণ কোণের রুমটিতে হযরত (রহ.) থাকতেন। আতর মেখে যখন রুম থেকে বের হতেন উত্তরের বারান্দা হয়ে হুইল চেয়ার মসজিদে প্রবেশের আগেই পূবাল হাওয়া মসজিদে বয়ে নিয়ে আসত বিশেষ আতরের পরিচিত সুগন্ধি। হযরতকে দেখার আগেই তাঁর সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ত।

রিয়াযত মুজাহাদা :

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর ইবাদত-বন্দেগী, রাত্রী জাগরণ তাঁর জীবনীর মাঝে এক আলোচিত বিষয়। ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন–

قدمت الكوفة فسألت عن ازهد اهلها فقالوا ابو حنيفة (مكانة الامام ابى حنيفة بين المحدثين ٥٦)

আমি একদা কুফায় গিয়ে লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ শহরে সবচেয়ে বড় বুজুর্গ কে? তারা বলল আবু হানীফা। হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন রিযাযত মুজাহাদার ময়দানে একজন বলিষ্ঠ শাহ সওয়ার। আবাসে বা প্রবাসে সদা তাহাজ্জুদগুজার। তাকবীরে উলার পাবন্দ। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের উজ্জ্বল নমুনা। হারামাইন শরীফের জিয়ারতে পাগলপারা। মাহে রমজানের হেফাজতে সদা সচেষ্ট। মাহে রমজানে বিনিদ্র রজনী কাটানো তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একে তো দীর্ঘ তারাবীহ, পনেরো দিনে এক খতম। তারপর সামান্য কিছু খেয়ে কোরআন শরীফ এবং তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ নিয়ে বসে যেতেন।

কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষ পাবন্দী করতে দেখা যেত। সারা বছরই এই আমলটি চলত। আযানের সাথে সাথে মসজিদে গিয়ে তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। চোখে দেখতে কষ্ট হতো তাই বিশেষ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত বাতি লাগানো হয়েছিল। তবুও তেলাওয়াত চালিয়ে যেতেন। শেষ দিকে এসে নিজে তেলাওয়াতের শক্তি হারিয়ে ফেললে পাশে এক তালিবুল ইলমকে বসিয়ে তার কাছ থেকে তেলাওয়াত শোনার মামুল বানিয়ে নিলেন। আর জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে যখন মুমূর্ষু অবস্থায় বিছানায় শায়িত থাকতেন তখনও তাঁর পাশে রাত-দিন চলত পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত। এতে তিনি প্রশান্তি লাভ করতেন। চোখে-মুখে ফুটে উঠত স্বস্তির লক্ষণ। যেদিন তিনি আমাদেরকে চির বিদায় দিয়ে চলে গেলেন পরপারে, সেদিন সেই মুহূর্তেও চলছিল তাঁর পাশে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত। তেলাওয়াতের ছন্দে ছন্দে ফেরেশতারা তাঁকে নিয়ে চলে যান মহা আনন্দে।

রোযার হেফাজত :

রোযাকে বলা হয়েছে ঢাল যদি তা ভেঙে ফেলা না হয়। তাই রোযার হেফাজতের গুরুত্ব অপরিসীম। মাজা শক্ত করে বেঁধে রোযার হেফাজতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) মাহে রমজান আগমনের দুই মাস পূর্ব থেকে দু'আ আরম্ভ করতেন–

اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان

হে আল্লাহ! রজব ও শাবানে আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমজানে পৌঁছে দিন। এ বিষয়ে ছাত্রদের মজলিসে এবং জুমু'আর দিন মুসল্লিদের সম্মুখে জোরালো বয়ান দিতেন। রমজানের হেফাজতের জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বলতেন। মারকাযের দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হতো ওই বিশেষ দু'আটি। সকল ছাত্র এবং বহিরাগতরা তা দেখে দেখে আমলের সুযোগ পেত।

হযরতওয়ালা (রহ.) বলতেন, দেওবন্দি মাদরাসার শিক্ষাবর্ষ আরবী প্রথম মাস মুহাররম বা ইংরেজি প্রথম মাস

জানুয়ারি থেকে আরম্ভ না করে শাওয়াল-শাবান ধার্য হয়েছে মাঝে রমজান মাস ফাঁকা রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, রমজানের পূর্বে শিক্ষাবর্ষকে সমাপ্তি করে রমজানে ইবাদত-বন্দেগী রিয়াযত মুজাহাদার জন্য ঝামেলামুক্ত হওয়া।

ছাত্রদের জন্য বাড়ির পরিবেশে অনেক সময় রমজানের হেফাজত যথাযথভাবে হয়ে ওঠে না। তাই মারকাযে মাহে রমজানব্যাপী তাসহীহে কোরআন ও তাদরীবের নামে রমজান হেফাজতের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে এক-দেড় হাজার আলেম-উলামা, ছাত্র-শিক্ষক অংশ নিয়ে থাকেন।

হযরতওয়ালা (রহ.) বলতেন, শায়খুল হাদীস জাকারিয়া (রহ.) রমজান মাস এলে লেখালেখির কাজ বন্ধ রাখতেন। এ মাসে তিনি সিয়াম সাধনা আর ই'তিকাফে মশগুল থাকতেন। তাঁরই অনুসরণে হযরতওয়ালা (রহ.) মারকাযে এমন এক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেন এবং অনেকটা সফলও হন। রমজানের শেষ দশকে হযরতওয়ালা (রহ.) উমরা আদায় করে সেখানেই ই'তিকাফ করতেন। অধিকাংশ ই'তিকাফ করেছেন তিনি মদীনা শরীফে।

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) মাহে রমজানে একষট্টি খতম করতেন। দিনে এক খতম রাতে এক খতম, ত্রিশ দিনে ষাট খতম এবং তারাবীহে এক খতম। হযরতওয়ালা (রহ.) ছাত্রজীবনে ইমাম আজম (রহ.)-এর জীবনী পড়ে এ কথা জানতে পারেন। এতে তিনি বিস্মিত হন কিন্তু নিজে এর ওপর আমল করার হিম্মত করতে পারলেন না। তবে তাঁর অন্তরে বিষয়টি রেখাপাত করে থাকে। পরবর্তীতে যখন বসুন্ধরা মারকাযে রমজান পালনের পরিবেশ তৈরি হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই বান্দার জন্য একষট্টি খতমের চেয়ে বহুগুণ বেশি সাওয়াব লাভের ব্যবস্থা করে দেন। দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রমজানের হেফাজতের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শত শত উলামায়ে কেরাম এখানে তাশরীফ রাখেন। তাঁরা কোরআন শরীফ খতম করে করে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর জন্য ইসালে সাওয়াব করতে থাকেন। অনেকে পারচা লিখেও হযরতওয়ালা (রহ.)-কে অবহিত করতেন। এখানে ই'তিকাফকারীদের অনেকে প্রতিদিন এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখা যায়। এমন কঠিন মোজাহাদা ও দেখা গেছে তাদের কাছে সহজ-সাবলীল। আর এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র পরিবেশের কারণে। হযরতওয়ালা (রহ.) মাহে রমজানে বসুন্ধরায় এমন এক পরিবেশই দেখতে চেয়ে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাঁর এ আকুতি কবুল করেছেন।

হজের তামান্না :

ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা হযরতওয়ালা (রহ.) প্রায় বলতেন। ছাত্র সময় তিনি ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনী পড়ে জানতে পারলেন যে তিনি গোটা জীবনে পঞ্চান্ন বার হজ আদায় করেছেন। হযরত বলতেন, একষট্টি খতমের হিম্মত আমার হয়নি। কিন্তু পঞ্চান্ন হজের নিয়্যাত করে দু'আ করে ছিলাম। আল-হামদুলিল্লাহ তা কবুল হয়েছে বলে মনে হয়। ওই সংখ্যা প্রায় পুরা হওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। ইমাম আজম (রহ.)-এর ঘটনা পড়ে ছাত্র সময় থেকে মক্কা শরীফ-মদীনা শরীফের মহব্বত তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে ঠাঁই করে নেয়। নাজিরহাট বড় মাদরাসায় মাধ্যমিক জামাআতে লেখাপড়ার সময় মাদরাসার পাশে একটি লাইব্রেরি ছিল। মালিক ছিলেন জনৈক হাজী সাহেব। বছর বছর তিনি হজে যেতেন। হজ থেকে ফিরে এলে হযরতওয়ালা (রহ.) তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইতেন সফরে কত খরচ হলো। এভাবে হজ করতে কত টাকা দরকার তার একটা অনুমান করতেন। ভাবতেন যে এত টাকা আমি কোথায় পাব? হ্যাঁ, যদি আমার বাবার মৃত্যু হয় তবে কিছু জমি পেলে তা বিক্রি করে যেতে পারতাম।

নিঃস্ব এক তালিবে ইলমের বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারতের এমন ব্যাকুলতা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেল। জমিজমা বিক্রি করতে হলো না। গায়বী খাজানা খুলে দেওয়া হলো। হজ আর উমরার ধারাবাহিক সফর চলতে থাকল। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রায় পঞ্চাশটি হজ ও একশটি উমরা আদায়ের তাওফীক তিনি লাভ করেছিলেন। এ সকল হজ-উমরায় তিনি অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন। একে তো হৃদয়ের প্রশস্ততা, দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যগত অপারগতা। সাধারণ প্যাকেজের তুলনায় হযরতওয়ালার (রহ.) তিন-চার গুণ বেশি খরচ করতে হতো। এতে কোনো রূপ কার্পণ্য করতেন না। ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে মারকাযের শিক্ষকদের এক বৈঠকে তিনি আলোচনা করছিলেন যে দুনিয়ার সম্পদ করা আলেমদের শান নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হজ-উমরার পেছনে আমি যে অর্থ ব্যয় করেছি তা দিয়ে অনেক সম্পদ করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কার জন্য করব? আমার দুটি ছেলে রেখে গেলাম। তারা আপনাদের সাথে দ্বীনের খেদমত করবে।

তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের এমন আশেক ছিলেন যে এতবার যিয়ারত সত্ত্বেও তাঁর তৃষ্ণা মেটেনি। আরেকবার যিয়ারতের আক্ষেপ নিয়ে তিনি চির বিদায় নেন। ইন্তেকালের পূর্বে কঠিন অসুস্থতার মুহূর্তে তিনি বলতেন, আমাকে বায়তুল্লাহ শরীফে নিয়ে যাও সেখানে গেলে সুস্থ হয়ে যাব।

বদলি হজ :

হযরতওয়ালার নামে যে সকল বদলি হজ করা হয়েছে তা হিসাব করলে পঞ্চান্ন হজ পার হয়ে যাবে। সেই ছাত্রজীবনে কচি মনের দু'আ। ইমাম আজম (রহ.)-এর সমপরিমাণ হজের তামান্না শেষতক প্রতিফলিত হয়েছে বলা চলে। ইন্তেকালের বছর তিনি হজে যেতে পারেননি। এ বছর বেশ কয়েকজন তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হজ

করেছেন। হযরতওয়ালা (রহ.) এতে বেশ আনন্দিত হয়েছিলেন। যেতে না পারার বেদনা হয়তো কিছুটা প্রশমন হয়েছিল। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে এমনি মনে হলো।

দিনটি ছিল জুমু'আ বার। আসরের পরে বেলা ডোবার আগমুহূর্তে চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী দু'আর জন্য মসজিদে তাশরীফ রাখলেন। একেবারে ক্ষীণকায় দুর্বল শরীর। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। বদলি হজের সংবাদ শোনাতে অনেকটা মনের জোরেই কথা বলছিলেন। দু'আর হক্ব তো আদায় করতে হবে। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন যাঁরা হযরতের জন্য এবার বদলি হজ করছেন। তন্মধ্যে মারকাযের উস্তাদ হযরতের অত্যন্ত স্নেহভাজন মুফতী সুহাইল সাহেবের (দা. বা.) ঘটনা অনেকটা অলৌকিক। যে ট্রাভেলসে তিনি হজের জন্য পাসপোর্ট জমা দিয়েছিলেন তারা জানিয়ে দিল যে আপনার ভিসা হয়নি। আপনাকে নিতে আমরা অপারগ। এ দুঃসংবাদ শুনে তিনি সালাতুল হাজত পড়ে দু'আ করলেন এবং নিয়্যাত করলেন যে ভিসা হয়ে গেলে এবার হযরতওয়ালার (রহ.) নামে বদলি হজ করব। পরদিন ট্রাভেলস অফিস থেকে জানানো হলো, আপনার ভিসা হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হযরতের কাছে গিয়ে পুরা ঘটনা শোনালেন।

দু'আর মজলিসে অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল চেহারা প্রফুল্লচিত্তে কথাগুলো বলে হযরতওয়ালা (রহ.) সেদিন সকলের জন্য মন খুলে দু'আ করলেন।

গীবতমুক্ত জীবন :

গীবত মানুষের নেক আমল ধ্বংসের এমন এক ছিদ্রপথ, যা দিয়ে সকল রিয়াযত মোজাহাদা নিঃশেষ হয়ে যায়। ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবন গীবতমুক্ত ছিল।

روى عن يحى الحمانى قال : سمعت ابن المبارك يقول قلت لسفيان الثورى يا ابا عبد الله ما ابعد ابا حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدوا له قط- قال هو: والله اعقل من ان يسلط على حسناته مايذهب بها (تاريخ بغداد ١٣/٣٦٣، تبييض الصحفية ١١٤)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-কে বললাম, আবু হানীফা (রহ.) গীবত থেকে কতই না পবিত্র। আমি কখনো তাঁকে কোনো দুশমনের গীবতও করতে শুনিনি। সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, তিনি অনেক বুদ্ধিমান, নেক আমল নষ্ট হওয়ার কোনো ছিদ্রপথ তৈরি হতে দেবেন না।

হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাতও (রহ.) মজলিসকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গীবতমুক্ত রাখার চেষ্টা করতেন। গীবতের কুফলের ব্যাপারে সকলকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, যেকোনো আন্দোলনের কথা শুনলে তালিবুল ইলমদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ আর চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। তারা লম্ফঝম্ফ শুরু করে দেয়। তাদেরকে আমি নতুন এক আন্দোলনের আহ্বান করব। আর সেটা হচ্ছে গীবত পরিত্যাগের আন্দোলন। গীবতমুক্ত জীবন গড়ার আন্দোলনে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো।

হিংসুকের হিংসা :

মানুষ যত বড় হয়, আল্লাহ তা'আলার মদদপুষ্ট হয় ততই তার প্রতি হিংসুকের বদনজর পড়ে, যারা তাকে চতুর্দিক থেকে সমালোচনার বাণে জর্জরিত করে তোলে। ইমাম আজম (রহ.) সমকালীন আলেম সমাজের মধ্যমণিতে পরিণত হওয়ায় তাঁর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের পরিমাণ বেড়ে যায়।

روى الخطيب عن ابن ابى داود قال : الناس فى ابى حنيفة حاسد وجاهل واحسنهم عندى حالا الجاهل (تاريخ بغداد ١٣/٣٦٧، تبييض الصحيفة ١١٠)

ইবনে দাউদ (রহ.) বলেন, আবু হানীফার ব্যাপারে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত অজ্ঞ এবং হিংসুক। আমার মতে, এদের মাঝে উত্তম হচ্ছে অজ্ঞ। তবে হিংসুকদের তিনি কখনো সমালোচনা করতেন না। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পঙ্‌ক্তি আওড়াতেন–

ان يحسدونى فانى غير لائمهم قبلى من الناس اهل الفضل قد حسدوا فدام لى ولهم ما بى وما بهم ومات اكثرنا غيظا بما يجد (تاريخ بغداد ١٣/٣٦٧، تبييض الصحيفة ١١٠)

ওরা আমায় হিংসা করলেও আমি ওদেরকে আঘাত করব না। আমার পূর্বেও বহু বড় বড় হাস্তিদের হিংসা করা হয়েছে। আমি তো আমার কাজেই মগ্ন থাকব; ওরা ওদের কাজ করে যাক। বিদ্বেষের রোষানলে জ্বলে অনেক হিংসুকের মৃত্যু হয়েছে।

হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর অবস্থাও ছিল এমন। হিংসুকের হিংসা, নিন্দুকের নিন্দা আর সমালোচকের সমালোচনার বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাঁর হৃদয়। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে চলতেন মঞ্জিল পানে। ইস্পাত কঠিন মনোভাব আর পাহাড়সম হিম্মত নিয়ে তিনি চালিয়ে যেতেন আপন মিশন। সুদীর্ঘ নব্বই বছরেরও অধিক হায়াতে তিনি বহু উতরাই-চড়াই মাড়িয়েছেন কিন্তু সাহস হারাননি। ব্রিটিশ আমল দেখেছেন, পাকিস্তান আমল দেখেছেন, বাংলাদেশ হওয়ার পর ক্ষমতার মসনদে কত রকম ওলট-পালট হতে দেখেছেন। যামানার পরিবর্তনের সাথে সদা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেন। কোনো পরিস্থিতি তাঁকে দমাতে পারেনি। চামচিকার চেঁচামেঁচি কি আর সূর্যের বিকিরণ রোধ করতে পারে?

তিনি বলতেন, মানুষ আমাকে গালমন্দ করে, এতে আমি মনোক্ষুণ্ন হই না। এটা আমার দুই মুরব্বির মিরাস। একজন হলেন হযরত মাদানী (রহ.), অপরজন হযরত থানভী (রহ.)। প্রথমজন আমার ইলমে জাহেরীর আর দ্বিতীয়জন ইলমে

বাতেনীর মুরব্বি। ভারত বিভক্তির আন্দোলনের সময় উভয়কে মানুষ গালমন্দ করেছে। হযরত মাদানী (রহ.)-কে হিন্দুদের দালাল আর হযরত থানভী (রহ.)-কে ইংরেজের দালাল বলে গালমন্দ করা হতো। আমিও এই গালমন্দের মিরাস পেয়েছি। এতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

হযরতওয়ালা (রহ.)-এর এমনো ভাব হুবহু ইমাম আজম (রহ.)-এর সাথে মিলে যায়। জানি না তিনি কি ইমাম আজম (রহ.)-এর জীবনী পড়ে এটা ধারণ করেছেন, নাকি আল্লাহ তা'আলাই তাঁর মনে সান্ত্বনার এ খোরাক জুগিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে নজর বোলালে আমরা হিংসুকদের ব্যাপারে এমন মনোভাব পোষণের শিক্ষাই দেখতে পাই। ইরশাদ হচ্ছে–

قل موتوا بغيضكم (ال عمران ١١٩)

বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। (সূরা আলে ইমরান-১১৯)

বস্তুত যুগে যুগে যাঁরা কিছু কাজ করেছেন তাঁরাই হিংসা আর নিন্দার শিকার হয়েছেন। কাজ করতে গেলে এটা হবেই। যার কোনো অবদান নেই, কৃতিত্ব নেই, কোনো খেদমত নেই, তার সমালোচকও নেই। এটাই এ ধরার নীতি। তাই হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলতেন–

محسود بنو حاسد مت بنو

হিংসুক হইয়ো না তবে হিংসার শিকার হলে কোনো অসুবিধা নেই।

দুনিয়া বিমুখতা :

ধন আর পদের মোহ মানুষের নৈতিক অধঃপতনের মূল কারণ। ইহুদী-খ্রিস্টান পাদ্রীগণ অবৈধ ধর্ম ব্যবসা হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আর কুরাইশ সর্দারগণ গদি হারানোর ভয়ে সত্যধর্ম ইসলাম কবুল করতে ব্যর্থ হয়েছিল। জীবনে যারা সফল হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছে, তারা সকলে নিজেকে হুব্বে মাল আর হুব্বে জাহ থেকে পাক রেখেছিল। হাদীস শরীফের ভাষায় দুনিয়ার লিপ্সা সকল পাপের উৎস।

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন–

ان ابا جعفر المنصور طلب ابا حنيفة من الكوفة الى بغداد وطلب منه ان يلى القضاء وتكون قضاة بلد الاسلام من تحت يده ، فاعتل بعلل ولم يقبل (تبييض الصحيفة ١٢٥، عقود الجمان ٢٥٧)

খলিফা আবু জাফর মনসুর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে কুফা থেকে বাগদাদ ডেকে পাঠালেন। তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হলো প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বিচারক তাঁর অধীনস্ত থাকবেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন ওজর-আপত্তি দেখিয়ে প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিলেন।

আমাদের দেশে এরশাদ সরকারের আমলে গ্র্যান্ড মুফতী হিসেবে একজন অভিজ্ঞ মুফতীকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ধর্ম মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন মহলে শুরু হয় এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, অনেকের নামে প্রস্তাব আসতে থাকে। এমন এক পরিস্থিতিতে তৎকালীন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হযরত মাওলানা মুফতী ওয়াক্কাস সাহেব (দা. বা.) ছুটে যান পটিয়ায় হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর কাছে। গ্র্যান্ড মুফতীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইমাম আজম (রহ.)-এর সাচ্চা উত্তরসূরি হিসেবে হযরতওয়ালা (রহ.) সেদিন ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, সরকারি পর্যায়ে এমন কোনো পদ তৈরি নিরাপদ নয়। আজ হয়তো সেখানে একজন হক্বপন্থী যোগ্য মুফতীকে বসানো হবে কিন্তু একসময় তা বাতিলপন্থী অযোগ্য লোকের হাতে চলে যেতে পারে। হযরতের (রহ.) এমন দূরদর্শিতার ফলে এ ধরনের পদ তৈরি হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

এত গেল হুব্বে জাহ তথা পদের মোহ ত্যাগের কথা আর যদি হুব্বে মাল তথা মালের মোহ তিনি কতটুকু ত্যাগ করেছিলেন তা লেখা হয় তবে তা এক বিশাল দাস্তানায় পরিণত হবে। এখানে শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরতওয়ালা (রহ.) একবার মদীনা শরীফে ই'তিকাফরত ছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফও (তৎকালে সাময়িক দেশান্তরিত হয়ে সৌদি আরবে অবস্থানরত অবস্থায়) ওই বছর মদীনা শরীফে ই'তিকাফ করছিলেন। হযরতের কাছাকাছিই তিনি বসতেন। হযরতের পরিচয় জানতে তাঁর খুব ইচ্ছে হলো। পাশে বসা হযরতের ভক্ত শাহ নূরুলগনী সাহেব থেকে হযরতের পরিচয় জেনে দেখা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। নূরুলগনী সাহেব হযরতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলেন। এবার নওয়াজ শরীফ বহু প্রতীক্ষিত সুযোগটি হাতে পেয়ে হযরতের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন। একপর্যায়ে তিনি কিছু হাদিয়া পেশ করলেন। হযরত (রহ.) বললেন, আপনার সাথে সবেমাত্র পরিচয় হলো, নতুন মানুষের কাছ থেকে হাদিয়া নেওয়া হয় না। তা ছাড়া হাদিয়া দিতে হলে আমার কাছে গিয়ে দিতে হবে। আমি বাংলাদেশে বসুন্ধরা মাদরাসায় থাকি। সেখানে এলে নেব। এ কথা বলে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দেওয়া মূল্যবান হাদিয়া গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন।

অর্থ-বিত্তের নির্মোহতার কত উচ্চে তাঁর অবস্থান ছিল, সেটা একমাত্র অনুমান করতে পারেন পরিচিত বিত্তশালী ও শিল্পপতিরা। তাই তো এর স্বীকৃতি তাঁদের মুখেই শোনা যায়। হযরতওয়ালার (রহ.) জানাযার দিন দেশের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জনাব ইঞ্জিনিয়ার শামীম সাহেব বলেছিলেন, হযরতের মাঝে কোনো লোভ ছিল না। আর তাঁর

কথাটি সত্যিই বাস্তব। তিনি হযরতকে (রহ.) খুব কাছ থেকে বরং ভেতর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরতের (রহ.) বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি সদা পাশে থেকেছেন।

তাওয়াক্কুলের পরাকাষ্ঠা :

সকল কাজে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা রাখা ঈমানের একটি অংশ। আল্লাহ তা'আলার ওপর কেউ যদি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে ভরসা করতে পারে তবে তাকে পাখির মতো রিজিক দেওয়া হবে। পাখি সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়, বিকেলে ভরা পেটে নীড়ে ফিরে আসে।

হযরতওয়ালা (রহ.)-এর রাজকীয় জীবনযাত্রার পেছনে তাওয়াক্কুলই মূল কার্জকারণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার গায়েবী খাজানার প্রতি তাঁর ভরসা বে-নজির। তাঁর জীবনের শেষ দিকের একটি ঘটনা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে মারকাযের গভীর নলকূপের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় তা মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক ব্যয়বহুল কাজ। গায়েবী খাজানার দিকে তাকিয়ে হযরত (রহ.) খুব জোরেশোরে দু'আ আরম্ভ করেন। একাকী এবং ছাত্রদেরকে নিয়ে বিভিন্ন মজলিসে দু'আ চলতে থাকে। পানির সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। বিভিন্ন বাসা থেকে ছাত্রদের পানি দেওয়ার এন্তেজাম চলতে থাকে। দলে দলে ছাত্ররা পাশের মাদরাসায় গিয়ে গোসল, কাপড় ধোয়ার এবং খাবার পানি সংগ্রহের কাজ চালাতে থাকে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে মারকাযের জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন। হযরতওয়ালা (রহ.)-কে তিনি বলেন, হুজুর, নলকূপের জন্য আমি পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চাই। তবে টাকাগুলো যাকাতের। এমন কঠিন মুহূর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়ে হয়তো কোনো হিলা-বাহানা করে তিনি কাজ করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার খাজানায় যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ তিনি কেন যাকাতের টাকায় হিলা করতে যাবেন। তাই যাকাতের টাকায় নলকূপ করতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। বললেন, ভাই, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে যাকাত ফরজ করেছেন, অনুরূপ এর ব্যয় খাতও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। গরিবদের মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায়ের পূর্বশর্ত। নলকূপে যাকাতের টাকা লাগালে যাকাত আদায় হবে না। এভাবে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। ঘটনাটি মসজিদে সকলের সামনে শুনিয়ে হযরত বললেন, মারকাযের শুরুলগ্নে যখন ভাত খেতে ভাত পাই নাই তখনও আমরা যাকাতের টাকা হিলা করে অন্য ফান্ডে খরচ করিনি। এটা আমাদের নিয়মের পরিপন্থী। যাকাতের টাকা আমরা লিল্লাহ ফান্ডেই খরচ করি, হিলায়ে তামলিকের মাধ্যমে অন্যভাবে ব্যয় করা হয় না। কিন্তু পানি সমস্যার তো একটি সামাধান হতেই হবে। তাই দু'আর প্রতি আরো জোর লাগানো হলো। এবার তাওয়াক্কুলের ফল প্রকাশের পালা। গায়েবী খাজানার দুয়ার খুলে গেল। যে ভদ্রলোক পাঁচ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন তাঁর এক শিল্প-কারখানায় গভীর নলকূপ বসানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। রীতিমতো তিনি নামকরা প্রসিদ্ধ এক বোরিং কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর মনে উঁকি মারে মারকাযের ছাত্রদের পানির কষ্টের বিষয়টি। সিদ্ধান্ত নেন আগে মারকাযের একটি নলকূপ দেবেন তারপর নিজেরটা। বোরিং কোম্পানির লোকজনকে সমস্ত মালসামানাসহ মারকাযে পাঠিয়ে দেন। শুরু হয়ে যায় নলকূপের কাজ। এবার আর যাকাতের টাকায় নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব খরচে ভদ্রলোক কাজটি সম্পূর্ণ করে দেন। এতে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা তিনি ব্যয় করেন। পাঁচ লাখ ফেরতে পঞ্চাশ লাখ প্রাপ্তি, গায়েবী খাজানার এমনই ব্যাপ্তি। আল্লাহ তা'আলার গায়েবী খাজানার ওপর ভরসা করে হযরত (রহ.) যেকোনো দু'আ করেছেন তার ফলাফল সকলে প্রত্যক্ষ করেছে।

প্রখর মেধা

ফিকহে হানাফীর ওপর হযরতওয়ালা (রহ.)-এর গভীর মোতালা'আ ছিল। সকল মাসায়েলের ব্যাপারে মৌলিক একটা ধারণা ছিল। তাঁর সামনে কোনো কিতাবের ইবারত পরে শোনানো হলে এর পূর্বাপর গোটা মাসআলা ধরে ফেলতে পারতেন। পটিয়া মাদরাসায় থাকাকালীন একটি ফাতওয়ার আবেদন এল। জনৈক ইমাম সাহেব নামায আরম্ভ করার পর সন্দেহ হলো যে নিয়্যাত ঠিকভাবে করা হয়নি। এ সন্দেহের ভিত্তিতে তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে সকল মুক্তাদীসহ পুনরায় তাকবীরে তাহরীমা পড়ে নিয়্যাত বেধেছেন। তার এ কাজটি সঠিক হলো কি না? উত্তর বের করতে দেওয়া হলো এক ছাত্রকে। অনেক সন্ধান করে সে বের করতে পারল না। কাছাকাছি অন্য ইবারত বের করে নিয়ে এল। হযরতওয়ালা (রহ.) ওই ইবারত শুনে বলে দিলেন, আরে ভাই এর পরেই আসল মাসআলাটি রয়েছে ভালো করে দেখে আসো। ছাত্র এবার ভালো করে সন্ধান করে ঠিকই পেয়ে গেল।

একবার এক ছাত্র এসে বলল–হুজুর! মুক্তাদীর নামাযে কোনো ভুল হলে সিজদায়ে সাহু লাগে না। কিন্তু ফাতাওয়ায়ে শামীতে লেখা হয়েছে সে নামায দোহরায়ে নেবে। এটা আমার বুঝে আসেনি। হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, শামীতে যদিও লিখেছে কিন্তু সে নামায দোহরাবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। ওই ছাত্র পরবর্তীতে এক কিতাবে হযরতওয়ালা (রহ.) যা বলেছেন হুবহু তাই পেয়েছে।

স্মরণশক্তি :

হযরতওয়ালা (রহ.)-এর স্মরণশক্তি খুব

বেশি ছিল। কোনো বিষয় মনে রাখার ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ বছর পরও তা স্মরণ থাকত। মিলাদ-কেয়াম প্রসঙ্গে একবার একটি বিস্তারিত ফাতওয়া লেখা হলো। বিভিন্ন কিতাবের দলিল-প্রমাণসহ হযরতওয়ালার (রহ.) কাছে পেশ করা হলে তিনি বললেন, المدخل থেকে তো কোনো দলিল নকল করা হয়নি। অথচ এ বিষয়ে মূল দলিলই সেই কিতাবে রয়েছে। হযরতের কথামতো ওই কিতাবে মাসআলাটি পাওয়া গেল এবং নকল করা হলো।

আরেকবার একটি মাসআলা এল। খতমে তারাবীহে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ জোরে তেলাওয়াত করতে হবে কি না? বিষয়টি ফিকহ-ফাতওয়ার কিতাবের মাঝে একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা। বিভিন্ন কিতাবের ইবারত হযরতওয়ালা (রহ.)-এর সামনে পেশ করা হলো। কিন্তু তিনি চাইলেন فتاوى رشيديه এর ইবারত। অথচ সেটা আনা হয়নি। হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে فتاوى رشيديه এর মাঝে আর আপনারা সেটাই দেখেননি? আমি তো দুর্বল হয়ে গেছি এখন আর কিতাব দেখতে পারি না। বিশ বছর পূর্বে মাসআলাটি পড়েছিলাম এখনো স্মরণ আছে। অতঃপর فتاوى رشيديه খুলে হযরত (রহ.) যেমনটি বলেছেন, ঠিক তেমনই পাওয়া গেল, সে অনুযায়ী ফাতওয়া দেওয়া হলো।

ইলমের পিপাসা :

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) ইলমের পিপাসায় গোটা জীবনব্যবস্থার মাঝে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। ইলমী ময়দানে পদার্পণের পূর্বে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ইলমের অন্বেষণ তাঁকে ব্যস্ত করে তোলে। দেশে দেশে বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মজলিস হয়ে ওঠে তাঁর ঠিকানা। ইলম অর্জনের জন্য নিজের জীবন-যৌবন সব কিছু উজার করে দেন। চার হাজার তাবেঈর কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন ইলম হাসিল করেন। হাম্মাদ (রহ.) একবার দুই মাসের জন্য সফরে বের হলেন। নিজের মসনদে স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন নির্ভরযোগ্য ছাত্র আবু হানীফাকে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এই দুই মাসে তিনি মোট ষাটটি মাসআলার সমাধান পেশ করেন। উস্তাদ হাম্মাদ (রহ.) ফিরে এল তাঁর কাছে যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নগুলো পেশ করেন। এতে দেখা যায় চল্লিশটির উত্তর সঠিক হয়েছে আর বিশটি ভুল হয়েছে। এতে ইমাম আজম (রহ.) খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিসে আরো দশ বছর সময় দিয়ে ইলম অর্জনে মশগুল থাকেন। ইলম অন্বেষণে এমন কুরবানীর ফলে হযরত হাম্মাদ (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ইমাম আজম (রহ.) অভিষিক্ত হন।

হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ইলম অর্জনের জন্য ছুটে যান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মজলিস দারুল উলূম দেওবন্দ। দাওরা পাস করার পর তাখাসসুসফিল ফিকহের সূচনার বছর তিনি একমাত্র বাঙালি হিসেবে ভর্তির সুযোগ লাভ করেন। গোটা বঙ্গদেশের জন্য ওই একটি কোটা বরাদ্দের কথা জেনেও উচ্চতর ইলম অর্জনের প্রেরণা থেকে সাহস করে দরখাস্ত দিয়েছিলেন, যা একজন সাচ্চা তালিবে ইলমের পক্ষেই কেবল সম্ভব হয়ে থাকে। এরপর আরো এক বছর মুঈনে মুফতী হিসেবে দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া বিভাগে সময় দিয়ে ইলমের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

পটিয়া মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতার সূচনা করেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি মোতালা'আ করে দরসের যথাযথ হক্ব আদায়ের চেষ্টা করতেন। তাফসীরে জালালাইনের দরস একসময় তাঁর জিম্মায় ছিল। লম্বা একটি টেবিলে জালালাইনের বিভিন্ন শরাহ/ব্যাখ্যাগ্রন্থ খুলে রাখতেন এবং হেঁটে হেঁটে কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতেন। অলসতাকে কখনো তিনি ঠাঁই দিতেন না।

পটিয়া মাদরাসায় একবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। একটি জ্বলন্ত ইটের কণা ছুটে এসে হযরতওয়ালার (রহ.) চোখে পড়ল। যন্ত্রণায় তিনি পুকুরে ঝাঁপ দিলেন। আল্লাহ তা'আলার কোনো হেকমত ছিল তাঁর চোখটি নষ্ট হয়ে গেল। বয়সজনিত কারণে অপর চোখের পাতাটিও স্বাভাবিকভাবে মেলত না। এমন মাজুর অবস্থায়ও তিনি কষ্ট করে কিতাব যথাযথ মোতালা'আ করে ছাত্রদেরকে পাঠদান করতেন। মাথার ওপর কয়েকটি বাতি জ্বালানো হতো এবং সাথে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে তিনি মোতালা'আ করতেন।

কোরআন হেফজ :

হযরতওয়ালা (রহ.)-এর মাঝে ইলম অর্জনের কী পরিমাণ পিপাসা ছিল তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সৈয়দ আসআদ মাদানী (রহ.) একবার চট্টগ্রাম সফরে এলেন। শুক্রবার ফজরের নামায তিনি সূরা সিজদাহ এবং সূরা দাহর দিয়ে সুন্নাত তরীকায় পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। সফরেও তিনি ওই আমলটি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিলেন। তিনি হেফজখানার হাফেজ সাহেবকে ডেকে বললেন, আগামী কাল শুক্রবার, ফজরের নামায সূরা সিজদা আর সূরা দাহর দিয়ে পড়াতে পারবেন? হাফেজ সাহেব সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। হযরতওয়ালা (রহ.) নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু ফজরের নামাযে ওই হাফেজ সাহেবকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি কোথাও পালিয়ে গেলেন। এত বড় সম্মানিত মেহমানকে সেদিন খুশি করতে পারলেন না হযরত (রহ.)। এতে তিনি খুব ব্যথিত হলেন। কারণ মেহমানকে খুশি করার জন্য তিনি সদা সর্বোচ্চ গুরুত্ব

দিয়ে চেষ্টার সবটুকু করে যেতেন। কিন্তু এবার আর হলো না। এ ঘটনার পর তিনি ওই দুটি সূরা মুখস্থ করার পণ করলেন, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় নিজেই ওই সূরা দিয়ে নামায পড়াতে পারেন। পরবর্তীতে চেষ্টা করে তিনি সূরা দুটি মুখস্থ করে ফেললেন। এ ঘটনা শুনিয়ে হযরতওয়ালা (রহ.) বলেন, সূরা দুটি স্মরণ রাখার জন্য আমি প্রতি শুক্রবার তাহাজ্জুদের নামাযে এগুলো তেলাওয়াত করে থাকি।

ফাতওয়া বোর্ড গঠন :

ইমাম আজম (রহ.) তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে বড় বড় ফকীহদের সমন্বয়ে ৪০ সদস্যের একটি ফিকহী বোর্ড গঠন করে রেখে ছিলেন। কোনো মাসআলা সামনে এলে বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। অবশেষে ইমাম আজম (রহ.) একটি সিদ্ধান্ত দিতেন।

এরই অনুকরণে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ফাতওয়া বোর্ড গঠন করেন। জটিল কোনো মাসআলার সম্মুখীন হলে সকলকে নিয়ে আলোচনা করতেন। সবাই খোলাখুলিভাবে নিজের মত প্রকাশ করত। যদিও সদস্যরা সবাই হযরতের ছাত্র ছিল। তথাপি তিনি ছাত্রদের সাথে মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতে ইতস্তত করতেন না। অবশেষে সকলের কথা শুনে হযরত এমন একটি সিদ্ধান্ত দিতেন যাতে সকলের কাছে মাসআলাটি পরিষ্কার হয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে এমন ফাহম ও হেকমত পরিলক্ষিত হতো যা দেখে তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে যেত।

বস্তুত ইলমে ফিকহ চর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে উস্তাদ ছাত্রের মুযাকারা। এতে ছাত্রের জ্ঞান পরিপক্ব হয় আর উস্তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। ছাত্র দিয়ে মাসআলা-মাসায়েল খোঁজানো হলে সে মেহনতি হয়ে ওঠে এবং তার মেধার বিকাশ ঘটে। এরপর উস্তাদের দিকনির্দেশনায় তার পথচলা সহজ হয়ে যায়। হযরতওয়ালা (রহ.) তাঁর ছাত্রদের এভাবেই গড়ে তুলতেন। বিভিন্ন মাসআলা তাদেরকে দিয়ে তালাশ করিয়ে আনতেন। মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, বুঝতেন এবং জরুরি রাহনুমায়ী প্রদান করতেন।

মসজিদে হারামে দরস :

সুদান ইউনিভার্সিটির বড় বড় কয়েকজন প্রফেসর, বিদগ্ধ আলেম একবার মক্কা শরীফে এলেন। উদ্দেশ্য–হাদীস শরীফের সনদ লাভ করা। তাঁরা ভাবলেন এখানে হয়তো এমন কারো সন্ধান অবশ্যই পাবেন, যাঁর কাছে উচ্চ সনদ রয়েছে। বহু সন্ধানের পর কারো খোঁজ না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা পবিত্র মসজিদে হারামের আন্ডার গ্রাউন্ডে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁদের একজন স্বপ্নঘোরে দেখতে পেলেন, একটি প্রবহমান নহরের কিনারে বসে একজন শায়খ হাদীসের পাঠদান করছেন। কেউ বলছে যে ইনি দেওবন্দী আলেম। ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নের কথা সাথীদের কাছে প্রকাশ করলেন। এবার সবাই মিলে দেওবন্দী কোনো আলেম এখানে আছেন কি না সন্ধান করতে লাগলেন। বহু খোঁজাখুঁজি করে তাঁরা হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সন্ধান পেলেন। হযরত (রহ.) ওই বছর মক্কা শরীফে ই'তিকাফে বসেছিলেন। স্বপ্নে দেখা ওই শায়খের সাথে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর হুবহু মিল দেখে তাঁরা খুশিতে আত্মহারা। সব কথা হযরতের কাছে খুলে বললেন। অতঃপর নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হযরতের কাছ থেকে হাদীস শরীফের সদন লাভে ধন্য হলেন।

মক্কা শরীফ কিংবা মদীনা শরীফ যেখানেই হযরতওয়ালা (রহ.) ই'তিকাফ করতেন আরব আজমের বহু আলেম তাঁর কাছে এসে সনদ লাভ করতেন। এভাবে পবিত্র হারামাইন শরীফাইনে গিয়েও তিনি পাঠ পাঠনায় ব্যস্ত সময় কাটাতেন।

ইলম অর্জনে উদ্‌গ্রীব :

ইন্তেকালের পূর্বে কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় যখন ডাক্তাররা সকলের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন তখন হযরতকে মারকাযের বাইরে জীবাণুমুক্ত বিশেষ ফ্ল্যাটে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে একান্ত জরুরতে কারো যেতে হলে বিশেষ ব্যবস্থায় তাকে প্রবেশ করানো হতো। এমন এক কঠিন সময়ও হযরতের (রহ.) ইলম অন্বেষণের চাহিদায় কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি। হযরতের প্রিয় মাসিক 'আল-আবরার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মাসআলা নিয়ে অধিক তাহকীকের প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত (রহ.) সেখানে বসেই এ নিয়ে ফিকির করতে থাকেন। সংশ্লিষ্ট জিম্মাদার উস্তাদকে ডেকে কিতাব থেকে মাসআলাটি বের করে আনার দায়িত্ব দেন। অবশেষে সঠিক বিষয়টি উদ্‌ঘাটন হওয়ার পরই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

আরেকটি দরসের আকাঙ্ক্ষা :

ইন্তেকালের মাত্র কায়েক দিন পূর্বের কথা। হযরত (রহ.) তখন একেবারে অন্তিম মুহূর্তে শয্যাশায়ী। তখনো কিছু কিছু কথা বলতে পারতেন। মাওলানা হারুন বোখারী সাহেব (দা. বা.) যাঁর দায়িত্বে রয়েছে বোখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের দরস। কিতাবুল মাগাজী হযরতওয়ালা (রহ.) পড়াতেন, বাকিটা তিনিই পড়ান। শয্যাপাশে গিয়ে মাওলানা হারুন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন–হুজুর, আপনার অংশ কি পড়ানো শুরু করব? হযরত (রহ.) বললেন, আমি তো এখনো মারা যাইনি। পড়াবেন তো আপনিই, আমি একটু শরিক থাকতে চাই। এই ছিল মনোবল আর ইলমের পিপাসার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। ওই শয্যা থেকে হযরতের (রহ.) আর ওঠা হয়নি। সেখান থেকে শুরু হয় পরকালের মহা সফর।